বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৪

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 733B.—February, 1934.—E

বিজ্ঞপ্তি

(প্রথম সংস্করণের)

বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী হইবে বিবেচনা করিয়া ১৩৩৩ সালে ও ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রথম প্রবন্ধটী ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় সবুজ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, ১৩৩৫ সালের তৃতীয় সংখ্যায়।

প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত। ভাষাগত ক্রিয়াপদ প্রভৃতি তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দের বানান, উপস্থিত অবস্থায় যতদূর সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ও প্রকৃতির অনুমোদিত করিয়া লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। চলিত ভাষায় একটী শব্দের বানান সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে: 'নোতুন' শব্দ। সাধারণতঃ ইহাকে 'নতুন'-রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে 'নৌতুন': ঔ-কারযুক্ত এই রূপ হিন্দীতে এখনও প্রচলিত আছে। 'নৌতুন' হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় 'নোতুন' বা 'নতুন'; সংস্কৃত 'নূতন' শব্দের আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নহে। বাঙ্গালায় প্রাকৃতজ ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের পূর্ব হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ায়, এইরূপ শব্দ-

সম্বন্ধে বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে ; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায় খুশী-মত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের উচ্চারণ এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়। বাঙ্গালা উচ্চারণের একটী বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্ত্তী অক্ষরে 'ই', 'উ' বা য-ফলা থাকিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা উচিত, তাহা না করিয়া এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া ও-কার না লিখিয়া, পরে 'ই' বা 'উ' থাকিলে মাত্র অ-কার দ্বারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি সূচিত করা হইতে থাকে। ফলে, 'নোতুন' স্থলে 'নতুন', 'গোরু' স্থলে 'গরু' (সংস্কৃত 'গোরূপ'—প্রশংসার্থে বা স্বার্থে 'রূপ' শব্দ-যোগ, তাহা হইতে প্রাকৃতে 'গোরূব, গোরূঅ', তাহা হইতে আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে 'গোরূ', বাঙ্গালায় 'গোরু'), 'মোতী' বা 'মোতি' স্থলে 'মতি' (মুক্তা অর্থে—সংস্কৃত 'মৌক্তিক', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'মোত্তিঅ,' তাহা হইতে ভাষায় 'মোতী'), ইত্যাদি বানানের উদ্ভব। শব্দের উৎপত্তি বিচার করিলে, ও-কার স্থলে অ-কার-লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয়।

আরও দুইটী কথা,—প্রবন্ধ দুইটীতে প্রযুক্ত ভারতীয় ভাষার নামের বানান লইয়া। 'বঙ্গভাষা' ও 'বঙ্গদেশ' অর্থে আমি সাধু-ভাষায় 'বাঙ্গালা' ও চলিত ভাষায় 'বাঙ্‌লা' লিখিয়াছি। আমি 'বাংলা' লিখি না : অনুস্বার দিয়া লিখিলে উচ্চারণের হানি হয় না, সত্য, কিন্তু চলিত ভাষায় জাতি-বাচক 'বাঙালী', 'বাঙাল'

শব্দের মধ্যে নিহিত, সংযুক্তাক্ষর 'ঙ্গ'-এর সরলীকরণে জাত 'ঙ'-র সহিত যোগ রাখিবার জন্য, দেশ- ও ভাষা-বাচক নামে 'ঙ' রাখিলেই ভাল হয় মনে করি। 'বঙ্গ'+'আল'>'বঙ্গাল'; 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল'; 'বঙ্গাল' শব্দে ফারসী প্রত্যয় 'অহ্' বা 'আ' যোগে দেশের ফারসী নাম 'বঙ্গালহ্, বঙ্গালা'; তাহা হইতে মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় 'বাঙ্গালা', আধুনিক 'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা': 'ঙ্গ = ঙ্গ্' হইতে 'গ'-এর লোপে মাত্র 'ঙ'-র অবস্থান, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায়, মধ্যস্থিত অক্ষরের স্বরাঘাত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ফলে অক্ষর-নিহিত স্বরধ্বনি আ-কারের লোপ। 'ঙ্গ'-এর দুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভাষায় বিদ্যমান: [১] 'ঙ্গ্', [২] 'ঙ': 'বাঙ্গালা'>'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা'। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানও অনেকে লেখেন, এবং ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই; তবে ইহা সাধু ভাষার অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন রূপ ('বাঙ্গালা') নহে, আবার চলিত ভাষার অনুমোদিত পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক উচ্চারণের অনুগামী রূপ ('বাঙ্লা')ও নহে—দুইয়ের মধ্যে একটা যেন আপোষ-নিষ্পত্তি। 'বাঙ্গালা' কেবল সাধু ভাষায়, 'বাঙ্গলা' সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়েই, এবং 'বাঙ্লা', কেবল চলিত ভাষায় —এই তিনটী বানান-সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। অনুস্বার দিয়া 'ঙ্গ, ঙ' লেখা অবশ্য আজকাল বহু-প্রচলিত (যেমন 'ভেংচা, রং, ভাং' প্রভৃতি শব্দে); কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের সানুনাসিক প্রলম্বী-

করণে : 'অং' = 'অআঁ' ; 'ইং' = 'ইই' ; 'উং' = উউ', ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল। আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলিতে, ইহাদের তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দাবলীতে, অনুস্বার হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অনুনাসিকরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ; যেমন 'করণকম্' > 'করণকং' > 'করণঅং' > 'করণয়ং' > মারহাট্টী 'করণেঁ' = করণ ; 'চলিতব্যকম্' > 'চলিতব্‌বকং' > 'চলিঅব্‌বঅং' > 'চলিঅব্‌বউং' > গুজরাটী 'চলবুঁ' ইত্যাদি। আজকালকার সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে ও ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই,—নানা বিশিষ্ট বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে ; যেমন দক্ষিণ ভারতে 'ং' = 'ম্' : 'হংসঃ, বংশঃ' = 'হম্‌স, বম্‌শ', 'সংস্কৃতম্' = 'সম্‌স্ক্রুতম্' ; উত্তর ভারতে 'ং' = 'ন্' : 'হংসঃ, বংশঃ, সংস্কৃতম্' = 'হন্‌স, বন্‌স্, সন্‌স্ক্রিৎ' ; আর বঙ্গদেশে 'ং' = 'ঙ্' : 'হংসঃ, বংশঃ, সংস্কৃতম্' = 'হঙ্‌শো, বঙ্‌শো, শঙ্‌শ্‌ক্রিতো' (বা 'শঙশ্‌ক্রিতো')। সুতরাং 'বাঙ্গালা' ও তজ্জাত 'বাঙ্‌লা'কে 'বাংলা' রূপে লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ (অর্থাৎ কিনা 'বাংলা' = 'বাআঁলা') ধরিলে, এই বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয় ; অপিচ সমপর্য্যায়ের 'বাঙ্গালী, বাঙালী' শব্দের সহিত বানানের দৃষ্টি-গত সাদৃশ্যকে অনাবশ্যক-ভাবে লোপ করিয়া দেওয়া হয়।

আমি ভারতের অন্য কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার নাম 'গুজরাটী, মারহাট্টী, উড়িয়া' (চলিত ভাষায় 'উড়ে') রূপে লিখিয়াছি। এই সব বিষয়ে একটু অবহিত হইয়া যাঁহারা লিখিবার

চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ 'গুজরাতী, মরাঠী, ওড়িয়া' ইত্যাদি 'শুদ্ধ' রূপে লিখিয়া থাকেন; এবং আমিও এইরূপ তথাকথিত শুদ্ধ (অর্থাৎ যে ভাষার নাম সেই ভাষার অনুমোদিত) রূপ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী', 'মারহাট্টী' (বা 'মারাঠী'), 'উড়িয়া' (চলিত ভাষায় 'উড়ে') প্রভৃতি লেখার পক্ষে। কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া, ইহাদের 'বিশুদ্ধ' রূপ লিখিয়া চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া অনাবশ্যকভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হয় মাত্র। 'সংস্কৃত' পদ 'গূর্জ্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি—'গূর্জ্জরত্রা' > 'গুজ্জরত্তা' > 'গুজ্জরত্ত' > 'গুজরাত'; তাহা হইতে ভাষা ও জাতি অর্থে 'গুজরাতী'; এবং গুজরাটের লোকেরা বরাবরই এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও করে—মূর্দ্ধন্য-ট-কার-যুক্ত পদ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রিক' > 'মহারট্‌ঠিঅ' > 'মহরাঠী' > 'মরাঠী'; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা 'গুজরাট' রূপই পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায় মূর্দ্ধন্য 'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ 'মহারাট্টী, মারহাট্টী', বা কচিৎ 'মারাট্টি', এবং জাতি-অর্থে 'মারহাট্টা'। মুখে আমরা বলি 'গুজরাট,—গুজরাটী হাতী, গুজরাটী এলাচ', 'মারহাট্টা দেশ', 'মারহাট্টী ভাষা', বা 'মারাঠা জাত', 'মারাঠী ভাষা'। মুখে আমরা বলিয়া থাকি 'উড়িষ্যা', 'উড়িয়া', বা 'উড়ে'; 'ওড়িশা', 'ওড়িয়া' আমাদের

কাছে অজ্ঞাত। 'অসমিয়া' ছাপার হরপে দেখিলেও, সকলেই বলি 'আসামী'। এই সকল রূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার—আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রাচীন রূপ। গুজরাটীরা, মারহাট্টীরা বা উড়িয়ারা কি বলে বা লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গ-দেশের ও -ভাষার নাম 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙ্‌লা', বা 'বাংলা'কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে 'বংগাল, বংগালী'; হিন্দীতেও তেমনি লেখে 'বংগাল-দেশ, বংগালী-জাতি, বংগলা-ভাষা'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন গুজরাট দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'ই ব্যবহার করে, কদাচ 'গুজরাত, গুজরাতী' লেখে না। 'হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানী' শব্দদ্বয়কে, তাহাদের বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী বা উর্দু উচ্চারণ ধরিয়া, 'হিন্দোস্তাঁ, হিন্দোস্তানী' লিখিলে, বাঙ্গালা ভাষার ও বঙ্গভাষীর প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danish, Norwegian, Welsh-এর বদলে, ঐ সকল ভাষায় ব্যবহৃত বিশুদ্ধ রূপ Français, Deutsch, Dansk, Norsk, Cymraeg লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রূপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ, ইংরেজ অর্থে Anglais, ও জারমান, দিনেমার, নরউইজীয় ও ওয়েল্‌শ্ জাতি বুঝাইতে Allemand, Danois, Norvégien, Gallois ছাড়া আর কিছুর প্রয়োগ করিবে না। বিশুদ্ধ রূপের নজীর দেখাইতে হইলে, প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার দিকেই প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রবন্ধ দুইটী প্রথম যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় সেইরূপই

রাখা হইয়াছে, অল্প দুই-চারি স্থানে ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। অবস্থা-গতিকে প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা উভয়ের ব্যবহার-সম্বন্ধে এই বইয়ের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় এবং ৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠায় কিছু বলা হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধু ভাষায় শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চ্চা করা, এবং বিশুদ্ধ ভাবে অর্থাৎ চলিত ভাষার সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধু ভাষায় লেখা—বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্য্য, ব্রত বা সাধনা। চলিত ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব শব্দ আছে, ধ্বনি-গত ও তদবলম্বনে বর্ণবিন্যাস-গত স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব বাক্যরীতি ও নানা রূঢ়ী প্রয়োগ আছে। যাঁহারা জন্ম ও শিক্ষাগত অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদিগের চলিত ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য সাধু ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চলিত ভাষারও ব্যাকরণ আবশ্যক; এখানেও নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম নিয়মের যে যথেষ্ট বাঁধাবাঁধী আছে, অনেক সময়ে আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। মাতৃভাষার আলোচনা আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত। এই আলোচনাকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন ও জাতীয় চিত্তের ও হৃদয়ের পরিচায়ক আমাদের সাহিত্য, তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ প্রীতি ও গৌরব-বোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এবং আমাদের ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক—যাঁহাদের লেখা

হইতে আমরা আনন্দ বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি—আংশিক ভাবেও তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের ইচ্ছা লইয়া, সেই পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে আমরা যেন কুণ্ঠিত না হই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
ভাদ্র ১৩৩৬ সাল,
সেপ্টেম্বর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই সংস্করণের শেষের তিনটী প্রবন্ধ নূতন করিয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। 'স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি' প্রবন্ধটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। 'বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রবন্ধদ্বয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের ও আমার সম্পাদিত ইস্কুলের উপযোগী বাঙ্গালা পাঠমালা ('সাহিত্য-শিক্ষা') পুস্তকে মৎ-কর্তৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটী এখন বহুস্থানে নূতন করিয়া লিখিত পরিবর্দ্ধিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। 'সাহিত্য-শিক্ষা' পুস্তকের প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সেন-রায় কোম্পানী (১৫ সংখ্যক কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) উক্ত প্রবন্ধ দুইটী ব্যবহারে তাঁহাদের সম্মতি দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে ছাত্র ও কৌতূহলী পাঠকবর্গের মনে আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব জাগরিত হইলে সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মাঘ, ১৩৪০,

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইত্যাদি

ৱ—অন্তঃস্থ ব, ইংরেজীর w-এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে। আসামী ভাষার বর্ণমালায় এই অক্ষর আছে।

ল়—মূর্দ্ধন্য ল, দেবনাগরীর ळ।

ঝ়—ফরাসী j-র ধ্বনি, ইংরেজী pleasure, measure শব্দের s-এর মত,—যেন কতকটা zh-এর ভাব।

*—কোনও শব্দের পূর্ব্বে এই তারকা-চিহ্ন দেওয়ার অর্থ, ঐ শব্দ বা তাহার মতন রূপ লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রূপটী হইতেছে সম্ভাব্য বা পুনর্গঠিত রূপ; আধুনিক কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোনও একটী রূপের বিকাশের ক্রম দেখাইতে গেলে, ভাষাতত্ত্ব-বিত্তার দ্বারা এইরূপ পুনর্গঠিত বা সম্ভাব্য রূপ স্থির করিয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত—পৃঃ ৩৬-৩৭, পৃঃ ৬৫-৬৬, পৃঃ ৭৪, পৃঃ ৮০।

>—পরিণতির, বা বিকাশের, বা বিকারের গতি-দ্যোতক চিহ্ন: সংস্কৃত 'হস্ত'>প্রাকৃত 'হত্থ'>প্রাচীন বাঙ্গালা 'হাথ'> মধ্যযুগের বাঙ্গালা 'হাত'>আধুনিক বাঙ্গালা 'হাত্'। ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে—সংস্কৃত 'হস্ত', তাহা হইতে (বা তা' থেকে, বা তার বিকারে) প্রাকৃতে 'হত্থ'; তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা 'হাথ' (হাথ্অ), তাহা হইতে মধ্যযুগের

বাঙ্গালা 'হাত' (হাত্‌অ), তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা 'হাত্‌' (হাৎ)।

<—উৎপত্তির বা পূর্ব্ববর্ত্তী রূপের গতি-দ্যোতক চিহ্ন : আধুনিক বাঙ্গালা 'হেঁট্‌'<মধ্যযুগের বাঙ্গালা 'হেঁট'<প্রাচীন বাঙ্গালা '*হেণ্ট'<অপভ্রংশ মাগধী '*হেণ্ট' < '*হেণ্টা' < মাগধী প্রাকৃত 'হেট্‌ঠা'<'*অহেট্‌ঠা'< '*অধেট্‌ঠা, *অধিট্‌ঠা' < কথ্য সংস্কৃত '*অধিষ্টাৎ'=সংস্কৃত 'অধস্তাৎ' ; ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে—আধুনিক বাঙ্গালা 'হেঁট্‌', তার পূর্ব্ব-রূপ (বা তার পূর্ব্বে, বা তার উদ্ভব-স্থল) মধ্য-যুগের বাঙ্গালার 'হেঁট' (হেঁট্‌অ), তার উদ্ভব-স্থল প্রাচীন বাঙ্গলায় সম্ভাব্য-রূপ 'হেণ্ট', তার উদ্ভব-স্থল মাগধী অপভ্রংশে পুনর্গঠিত রূপ 'হেণ্ট', তার পূর্ব্বের সম্ভাব্য-রূপ 'হেণ্ট', তার পূর্ব্ব-রূপ মাগধী প্রাকৃতে 'হেট্‌ঠা', তার উৎপত্তি-স্থল সম্ভাব্য-রূপ 'অহেট্‌ঠা', তার পূর্ব্বে সম্ভাব্য-রূপ 'অধেট্‌ঠা' বা 'অধিট্‌ঠা' তার পূর্ব্বে কথ্য-সংস্কৃতের পুনর্গঠিত রূপ 'অধিষ্টাৎ', যার তুল্য (বা সমান) হইতেছে সংস্কৃত শব্দ 'অধস্তাৎ'।

=—তুল্যার্থতা বা তুল্যোৎপত্তি, বা সগোত্রভাব, বা সমান-পর্য্যায়-দ্যোতক চিহ্ন। বাঙ্গালা 'লাড়ু',=সংস্কৃত 'লড্ডুক'—ইহাকে পড়িতে হইবে—বাঙ্গালা 'লাড়ু', তার সমান পর্য্যায়ের সংস্কৃত 'লড্ডুক'। ইহার অন্য পাঠ-রীতি নিম্নে দ্রষ্টব্য।

+—সংযোগ-বাচক চিহ্ন। 'তাতে যুক্ত', বা 'আর'—এইরূপে পড়িতে হইবে। 'কান'+'উ'='কানু' : ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে—'কান' আর 'উ', অথবা 'কান' শব্দ, তাতে যুক্ত 'উ' প্রত্যয়, ফলে (বা মিলিয়া হইল) 'কানু'।

√—ধাতু-বাচক চিহ্ন। '√পর < পহ্র, পর্হ < পহির < পরিহ <পরি+√ধা' : ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে—'পর'ধাতু, তার পূর্ব্বরূপ 'পহ্র' বা 'পর্হ', তার পূর্ব্বরূপ 'পহির', তার পূর্ব্বে 'পরিহ', তার উদ্ভব-স্থল 'পরি' উপসর্গ-যুক্ত 'ধা' ধাতু।

সূচীপত্র

বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

[শিবপুর সাহিত্য-সংসদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩]

আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুস্কিলেও ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই—ভাষাতত্ত্বের খুঁটীনাটী হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়,—আমার মাষ্টারী ব্যবসায়ের পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে অন্যের কাছে এটা তত' আনন্দজনক হবে না—এ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমায় কিছু ব'লতে হবে, অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে উপস্থিত হবো ঠিক ক'রতে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের এই বাঙালী-জা'তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ আপনাদের সমুখে নিবেদন ক'রবো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের

সকলের আস্থা আর অনুরাগ আছে,—আর নিজের জা'তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী-রকমে সাত্মাভিমান ; অতএব খালি বিষয়ের গৌরবের জন্তেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌ছি।

পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, তার সংখ্যা হবে আট শ' থেকে ন' শ'র মধ্যে। এর ভিতর নাকি দু' শ' কুড়িটী বর্ম্মা-সমেত ভারতবর্ষে বলা হয় ; বর্ম্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা নাকি দাঁড়ায় এক শ' ছেচল্লিশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার সময় ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মোটামুটী একটী হিসেব নেওয়া হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিয়ে' কোন কথা ব'ল্‌তে গেলে বর্ম্মাকে বাদ দেওয়া উচিত ; কারণ যদিও বর্ম্মা এখন ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি-নীতি সব বিষয়েই বর্ম্মা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং সিংহলকে ভারতের অংশ ব'লে ধরা উচিত, যদিও সিংহল ভিন্ন-সরকার-দ্বারা শাসিত। এখন, ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হ'য়েছে—একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক বশতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী দাঁড়িয়েছে। যত' সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপ-ভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে আলাদা ধ'রে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের (প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহির্ভূত) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে' পড়ায়, সংখ্যাটা এত' ফেঁপে' বেড়ে উঠেছে। ভারতের ভাষাগুলি চারটী মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে :—[১] আর্য্য গোষ্ঠী,

[২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] কোল গোষ্ঠী, [৪] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আসাম আর বর্ম্মার সীমান্ত, তিব্বত আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে' শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এরা অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিব্বতী (আর বর্ম্মায় বর্ম্মী) ছাড়া অন্যগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর অতি অল্পসংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এই সব ভাষা বলে। কোল গোষ্ঠীর ভাষা হ'চ্ছে সাওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর প্রভৃতি। কোল ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও নয়,—সব-শুদ্ধ ত্রিশ লাখ-এর বেশী হবে না। কোল ভাষা হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোঙ্গোল জাতের লোক ভারতে আস্‌বার আগেও কোল ভাষার (অর্থাৎ কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী আর্য্য-ভাষীদের প্রভাবে প'ড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই কোল-ভাষী লোকেরা আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আস্‌ছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তার জায়গায় বাঙলা, হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্য-ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা ১৫০ বছর লাগ্‌বে—অবশ্য কোল-ভাষীরা এখন যে অনুপাতে আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'র্‌ছে সেটা যদি বজায় থাকে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর

ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে চলে, আর তা'-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অনুন্নত জা'ত আর বেলুচীস্থানে ব্রাহুই-জা'তও দ্রাবিড় ভাষা বলে। দক্ষিণ-ভারতে তামিল, মালয়ালী, কানাড়ী আর তেলুগু—এই চারটে হ'চ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন দ্রাবিড় ভাষা। বিশেষতো প্রাচীন তামিল সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়-ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে ছ' কোটির কাছাকাছি—আর, সুসভ্য দ্রাবিড়গণের আর্য্যধর্ম্ম আর সভ্যতা বাহ্যতো মেনে-নেওয়ার ফলে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে (ব্রাহুই আর মধ্য-ভারতের অদ্ধ-সভ্য দ্রাবিড় জা'তের ভাষাগুলি ছাড়া)।

তারপরে বাকী থাকে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-সীমান্ত পর্য্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটা বড়ো শাখা। পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখ্‌লে, এই ক'টী শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেল্‌তে পারা যায় :—

[১] পূবে' বা পূর্ব্বী শাখা : এর ভিতর বিহারের মৈথিল, মগহী আর ভোজপুরে', যথাক্রমে এক কোটি, ষাট লাখ আর এক কোটি আশী লাখ লোকে বলে ; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে', যথাক্রমে চার কোটি নব্ব্‌ই লাখ, পনেরো লাখ আর নব্ব্‌ই লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত।

[২] মধ্য-পূর্ব্বী শাখা বা পূর্ব্বী-হিন্দী : এর তিন প্রকার রূপভেদ আছে,—অযোধ্যা প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য-প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের

ভাষা ছত্রিশগড়ী ; সব-শুদ্ধ দু' কোটি সাতাশ লাখ লোকে এই পূর্ব্বী-হিন্দী ব্যবহার করে।

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা বা পশ্চিমা-হিন্দী : চার কোটি দশ লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাষা, কনোজ-অঞ্চলের কনোজী, বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলী, অম্বালা-অঞ্চলের আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঞ্জাব অঞ্চলের মৌখিক ভাষা, আর দিল্লী, মীরাট-অঞ্চলের হিন্দুস্থানী। এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দু'টী,—এক, উর্দ্দু, আর দুই, হিন্দী ; এই হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু বা হিন্দী ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে' প'ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

[৪] দক্ষিণ-পশ্চিমা শাখা বা রাজস্থানী-গুজরাটী : এর মধ্যে পড়ে মাড়োয়ারী, মালবী, জয়পুরী, হারোতী প্রভৃতি রাজ-পুতানার নানা ভাষা, যা এক কোটি চল্লিশ লাখ আন্দাজ লোকে বলে ; আর পড়ে গুজরাটী ভাষা, যা আনুমানিক এক কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে।

[৫] উত্তর-পশ্চিমা শাখা : এর মধ্যে আসে পূর্ব্বী-পাঞ্জাবী (এক কোটি আটান্ন লাখ), লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী (আট-চল্লিশ লাখ), আর সিন্ধী (ছত্রিশ লাখ)।

[৬] দক্ষিণী বা মারহাট্টী শাখা : এক কোটি নব্বুই লাখ লোক এই ভাষা বলে।

[৭] উত্তুরে' বা হিমালয়ের শাখা : কাশ্মীর আর পাঞ্জাবের পূর্ব্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ভোটান পর্য্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ-অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে

নাম ক'র্‌তে পারা যায় এই তিনটীর—(১) গুর্খালী বা নেপালী বা পর্ব্বতীয়া বা খাস্‌কুরা,—গুর্খাদের ভাষা; (২) কুমাউনী, (৩) গাড়োয়ালী। সব-শুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ।

[৮] সিংহল দ্বীপের আর্য্যভাষা সিংহলী—ত্রিশ লাখ।

এ ছাড়া, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চল থেকে কতগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপে ছড়িয়ে' পড়ে। সেই সব দেশে তারা যাযাবর-বৃত্তি বা ভব-ঘুরে' বেদের জীবন অবলম্বন করে। ইংরিজীতে এদের Gipsy (জিপ্‌সি) বলে; ইউরোপে বহু স্থলে এই জিপ্‌সিরা এখনও আমাদের ভারতীয় আর্য্যভাষাই বলে।

কাশ্মীরে কাশ্মীরী আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে সংপৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,—যেমন শীণা, চিত্রালী প্রভৃতি; এগুলিও আর্য্যভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্যভাষাগুলি থেকে একটু তফাৎ; আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টী পরস্পর স্বস্-সম্বন্ধে সম্পর্কিত।

(২)

খ্রীষ্টীয় ১৯২১ সালের লোকগণনার হিসেবে বাঙলা ভাষা চার কোটি নব্বুই লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতুন ঠেক্‌বে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে ভারতে আর কোনও ভাষা এত' বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবশ্য

হিন্দুস্থানী বা হিন্দীভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দীভাষার স্থান আর গৌরব বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা হিসেবে। সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে বাদ দিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক,—পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতে, মধ্য-প্রদেশের অনেকখানিতে, আর বিহারে—হিন্দুস্থানী ভাষাকে (তার হিন্দী রূপেই হোক্ আর উর্দ্দু রূপেই হোক্) তাদের সাহিত্যের ভাষা ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় ১৩ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষা ; আর এই ১ কোটি ৬০ লাখ ছাড়া আরও আড়াই কোটি আন্দাজ লোকে ব্রজভাখা, কনৌজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে এক-ই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যেগুলিকে হিন্দুস্থানীরই রূপভেদ ব'ল্‌তে পারা যায়। এদেরও মাতৃভাষাকে হিন্দুস্থানী ব'লে ধ'রলে খুব বেশী ভুল হয় না। কাজেই যে ১৩ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১০ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জাত্ হিন্দুস্থানী-কইয়ে',—হিন্দুস্থানী এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্‌শী-মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা ভাষা নয়। বাকী ৮ কোটি ৯০ লাখ ঘরে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, মালবী, গাড়োয়ালী, আউধী,

ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরে’, মৈথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে ; কিন্তু বাইরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, আদালতে, ইস্কুলে তারা মাতৃভাষাকে বর্জ্জন ক’রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। এই জন্যেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর প্রতাপ ভারতে এত’ বেশী, এই জন্যেই হিন্দুস্থানী ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ’য়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই জন্যেই ভারতের লোকসমাজে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা বেশী জায়গা জুড়ে’ র’য়েছে।

কিন্তু তাই ব’লে বাঙলার স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের একষষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত’ লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধ’রে বিচার ক’র্‌লে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হ’চ্ছে সপ্তম ;— বাঙলার আগে নাম ক’র্‌তে হয় —[১] উত্তর-চীনা (২০ কোটির উপর), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৫ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোটি), [৪] জার্ম্মান (৭॥০ কোটি), [৫] স্পেনীয় ভাষা (৫॥০ কোটি), [৬] জাপানী (৫ কোটি ২০ লাখের উপর), আর [৭] বাঙলা (৪ কোটি ৯০ লাখ)। Culture language বা মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসেবে, বিদেশী ইংরিজীর পরেই, এ দেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলারই আদর বাঙলার বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারহাট্টী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালী-ভাষী বহু ইংরিজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙলা প’ড়্‌ছেন দেখা যায়, আর বাঙলা থেকে নিজেদের ভাষায় বই অনুবাদ ক’র্‌ছেন। হিন্দী বা উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচার হ’য়েছিল উত্তর-ভারতের

মোগল-যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসকসম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যারা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে'-পড়ার ফলে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহুল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে' যাবার সুযোগ ঘটেনি। দু'-চার জন শিক্ষিত বাঙালী যাঁরা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার দিক্ থেকে ধ'রলে তাঁরা তলিয়ে' গিয়েছেন; কিন্তু বাঙলাদেশে থেকেই, তার সাহিত্যের জোরে বাঙলা ভাষার প্রভাব ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে আর ভারতের অন্যান্য ভাষার উপর বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে, তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তার ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ একটা মমতা-বোধ হ'য়েছে। তার সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী তার জাতীয় culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্-সম্বন্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙলার যাঁরা যথার্থ লোকনেতা হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই তার সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলার তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলাদেশ আর বাঙালীজা'ত-সম্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন—

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা,
বাঙালীর প্রাণে যত' ভালোবাসা,—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্

আর এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত বাঙালা-ভাষীরই আকাঙ্ক্ষা।

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যারা বলে সেই বাঙালীজা'তের উৎপত্তি আর অভ্যুত্থানের দিগ্‌দর্শন ক'র্‌বো। যা নিয়ে' আমরা গর্ব্ব করি, সেই জিনিষটী আমরা যেন' সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনার ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব্ব যেন' জ্ঞানের অবলম্বনে সুদৃঢ় হয়। আত্মবোধ বা যে কোনও বোধ জ্ঞান-প্রসূত না হ'লে অন্ধ-বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময়ে আত্মঘাতী হয়।

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলাদেশ জুড়ে' বিদ্যমান র'য়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা কইছি, লিখ্‌ছি, এর জীবন্ত মূর্ত্তি আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার মূর্ত্তি কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত' মানুষ, তত' বিচিত্ররূপে এক-ই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষাই একটী বহুরূপী বস্তু—সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদ্‌লায়, আবার কাল-ভেদেও তেম্‌নি বদ্‌লায়। আবার অবস্থাগতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চল্‌তি ভাষা,—যেটা হ'চ্ছে শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্রসমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন ক'র্‌ছি, যে ভাষা

এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা-সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; আর যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'লছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চ'লতে থাকলে, যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে,—এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হঠিয়ে' দিয়ে'। বাঙলার এই দুই সর্ব্বজন-পরিচিত মূর্ত্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্ত্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্ত্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই সব মূর্ত্তিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা-ত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে, অথচ এরা স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই সকল শাখাই স্ব-স্ব-প্রধান, কেউ কারু চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে বিচার ক'রলে, বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূল্য। তবে একটী বিশেষ শাখা অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়,—কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়স্থান হ'য়ে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়,—তখন স্বভাবতো অন্য শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক-সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টি-পাত করে না। একদিকে যে ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের

আশ্রয়স্থল, আর অন্যদিকে জীবনের রসের দিক্ থেকে সব চেয়ে সুমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, তার মূল কোথায়, কতদিনে কি ভাবে এই তরু এত' বড়ো হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতূহল হওয়া উচিত—অন্ততো শিক্ষার স্পর্শে আমাদের মনে এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত।

ভাষার static অর্থাৎ কোনও এক নির্দিষ্ট কালে তার শুদ্ধ বা নিশ্চল অবস্থা মনে ক'রে গাছের সঙ্গে আমি তার এই উপমা দিলুম। আবার তার dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো তার উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই নদীর উপমাটী বড় চমৎকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, কোনও জা'তকে অবলম্বন ক'রে একটী ভাষার গতি এক দিকে, আর দেশ থেকে দেশান্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে—এ দুইয়ের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, এক বংশ-পীঠিকা থেকে আর এক বংশ-পীঠিকায় পারম্পর্য্যক্রমে বাহিত হ'য়ে আমাদের ভাষা-স্রোত চ'লে আ'সছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—প্রায় ৫ ক্রোড় নরনারীর জিহ্বা আর মস্তিষ্ক জুড়ে' এর বিস্তার; এর নিজস্ব, আর তা ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট্ শব্দসম্ভারে এর কূল ছাপিয়ে' উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দ্বারা ফলবান্ হ'চ্ছে; দূর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ঐশ্বর্য্য এর স্রোত বেয়ে' এ দেশে আসছে। কত শতাব্দী ধ'রে, কেমন সরলভাবে বা এঁকে-বেঁকে এই নদীর গতি চ'লে এসেছে, কোন্ কোন্ উপনদী এতে

এসে প'ড়ে তার কর-সম্ভার দিয়ে' একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন্ কোন্ নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে ; কোন্ মরা গাঙের খাত্ দিয়ে' বা এর জল বান উজিয়েছে, কোন্খানে বা এর জল শুখিয়ে' চড়া প'ড়ে গিয়েছে—অর্থাৎ কিনা কি রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ থেকে কোন্ ভাষা কি পদ্ধতিতে ব'দ্‌লে ব'দ্‌লে কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে ব'সেছে, কোন্ কোন্ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি ক'রেছে ; কোন্ সময়ে আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার প্রাচীন রূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ ধারণ ক'রেছে—তা ধ্বনিতেই হোক্, বা প্রত্যয়েতেই হোক্, বা বাক্য-রীতিতেই হোক্ ; বা কোথায়, কি ক'রে, কবে, কোন্ অনার্য্য বা অন্য ভাষাকে তাড়িয়ে' দিয়ে বাঙলা তার স্থান অধিকার ক'রেছে, আর সেই লুপ্ত ভাষা ম'রে গিয়েও তার ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা ভাষার উপরে দিয়ে' গিয়েছে ;—কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে জা'তের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফূর্ত্তি পেয়েছে ; কি রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে নি ;—এই সবের ফলে কি ক'রে বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে ;—এর আলোচনা একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ আর অনেকটা এই বিদ্যার শাস্ত্র-অনুসারী বিচার-সাপেক্ষ হ'লেও, আমার মনে হয় মানসিক-সংস্কৃতি-কামী ইতিহাস-প্রিয় শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে এটা একটা সার্থক আলোচনা ;—কেবল-মাত্র ঐতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আর

বিচার-শক্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার যোগ্যতা ধরে ব'লে, এই আলোচনার বিশেষ একটু মূল্য আছে।

(৩)

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে দু'দিকে দু'টা অবধি পাই—এক দিকে হ'চ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, এই ১৩৩৩ সাল, আর এখনকার চল্‌তি বাঙলা ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করি; অপর দিকে হ'চ্ছে ঋগ্‌বেদের কাল, আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাঙলা কি মূর্ত্তি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা করার কোন সার্থকতা নেই। ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বে আর্য্যভাষার কি রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারিনি; কিন্তু তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব নামে যে আধুনিক বিদ্যা আছে, তার অনুমোদিত অনুশীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয় আলোচনা ক'রে তার অনেকখানি আমরা অনুমান ক'র্‌তে পারি। কিন্তু ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বের কোনো বই বা লেখা আমরা পাই না, এখানে হ'চ্ছে বস্তুর অভাব। সেইজন্যে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না; আমাদের অনুমান যে সত্য সে সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাক্‌লেও, সেটা প্রমাণিত হয় না। ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বের যুগের আদি-আর্য্যভাষার অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর তাকে, তার দুহিতৃস্থানীয় বৈদিক, প্রাচীন ইরানীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক, জার্ম্মানিক, শ্লাভ প্রভৃতির পরস্পরের তুলনা-দ্বারা নোতুন ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার প্রয়াস, বেশ একটা

কৌতুকপ্রদ বিদ্যা। কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তার যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত। এ যেন' কোনও মানুষের জীবনচরিত লিখ্‌তে গিয়ে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহ থেকে আরম্ভ ক'রে ক' পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করা; আমাদের এখন অত দূরের কথা ভাব্‌বার দরকার নেই। ঋগ্‌বেদের ভাষা ভারতের আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ঋগ্‌বেদের ভাষায় এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়; আর যেখানে ভারতীয় আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির জড় গিয়ে পৌঁছেচে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝ্‌তে বাকী থাকে না। সকলেই জানেন যে, ঋগ্‌বেদ দেবতাদের আরাধনা-বিষয়ক কবিতা বা স্তোত্রের একটী সংগ্রহ—এতে ১,০২৮টী 'সূক্ত' বা স্তোত্র আছে। এই সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা কবিরা রচনা ক'রেছেন। এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বই-এ সঙ্কলন করা হয়। এই সঙ্কলনটী কবে যে করা হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না; তবে কেউ কেউ মনে করেন সেটী আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বের দিকে হ'য়েছিল, কারও বা মতে আরও ২।৩ শ' বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১৫০০ বা ২০০০, বা ২৫০০ বা ৩০০০, বা ৪০০০ বছর পূর্ব্বে, এমন কি তারও আগে, এই সঙ্কলন হ'য়েছিল। আমি প্রথম মতটাকেই, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকেই, সমীচীন ব'লে মনে করি—তার পরে হ'তেও পারে তা স্বীকার করি, কিন্তু তার পূর্ব্বে আর যেতে চাই না। অন্য সব মতের কথা এই ক্ষেত্রে এখন আলোচনা ক'র্‌বো না। আনুমানিক ১০০০

খ্রীষ্ট-পূর্ব্বে সঙ্কলিত হ'লে, ঋগ্‌বেদের অনেকগুলি সূক্ত বা স্তোত্রের রচনাকাল তার ৩।৪।৫।৬ শ' কি আরও বেশী বছর আগে ব'লে অক্লেশে ধরা যেতে পারে। ঋগ্‌বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটী ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্টী পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে আদি-আর্য্যভাষার নদী ব'য়ে এসেছে। ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব থেকে আজকালকার দিন পর্য্যন্ত—ধরা যাক্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই প্রায় ৩৫০০ বছর ধ'রে আর্য্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটী একরকম বেশ পরিষ্কার-ভাবে দেখ্‌তে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে—বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ, পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত ইতিহাসে পুরাণে নাটকে কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন' একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত চলে এসেছে,—পর পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি হ'চ্ছে এই শিকলটীর এক একটী কড়া বা আংটা। কিন্তু কালের মহিমায় আর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটী বা আংটাটী এখন আর যথাযথ একটীর পর একটী ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ পর পর প্রত্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আ'সেনি। যেখানে-যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাঁক র'য়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে' ভাষার গতি হ'য়েছিল, সেটা অনুমান ক'রে নিতে

হয়। ভাষা-স্রোতস্বিনী ব'য়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে তার ধারার রেখাটি অস্পষ্ট, আর এই অভাব তাকে বহু স্থানে আমাদের চোখের আড়ালে অন্তঃসলিলা ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে' বইয়ে' এনেছে।

এখন আমরা মন দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে' রেখে' যাচ্ছি, আমাদের বিরাট্ আর প্রবর্দ্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে থাক্‌ছে; আর তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে গ্রামো-ফোনের রেকর্ডে গানে, আবৃত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের ভাষার ছায়া ধরা থাক্‌ছে—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের ভাষা-চর্চ্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা ক'র্‌বে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য্য হবে। সুতরাং আমাদের এই কালের ভাষার আলোচনার জন্যে আজ থেকে দু-তিন শ' বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক।পরিশ্রম ক'র্‌বেন, তাঁদের জন্যে অনেক উপযোগী মাল্-মশলা বেশ ভালো ক'রেই প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌ছে। সন ১৫৩৩ বা ১৭৩৩ সালে ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও, অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই গলায় রেকর্ডে শুন্‌তে পাবেন—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে' ইউরোপের কোথাও কোথাও ভাষাতত্ত্ব সংগ্রহাগারে এই রকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'চ্ছে। আমরা যদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম, যদি বুদ্ধদেবের সময়ে গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাক্‌ত, আর যদি তাঁর দু'-একটা উপদেশ তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কণ্ঠে শুন্‌তে পেতুম! বৈদিক ঋষিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি শোন্‌বার উপায়

থাকৃত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী ঢঙে আশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহস্যের ভাবে ব'ল্‌ছি না—অমি খালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্তেই ব'ল্‌ছিলুম যে, অল্পস্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যুগের ভাষা আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটা কত-টুকুই বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আর্য্যভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে' এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'র্‌তে গেলে বস্তুর অভাব-জনিত এই অসুবিধাটুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়।

বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়্‌-বাড়ন্ত। এক শ' বছর আগে এই ভাষার কি অবস্থা ছিল তা আমরা তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝ্‌তে পারি। তখন দু'-এক-খানা ব্যাকরণও লেখা হ'য়েছে, তা থেকে আমরা কিছু কিছু খবর পাই, আর বুঝ্‌তে পারি যে, সাধু-ভাষা, চল্‌তি-ভাষা, প্রাদেশিক-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলা ভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্ব্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যেই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তখন লেখা হয়নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা ভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল পেরিয়ে তবে ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। আঠারো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোলো থেকে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তর বাঙলা পুঁথি পাওয়া যায়; তার

থেকে ওই দু' শ' বছরের বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'র্‌তে পারা যায়। আর ওই দু' শ' বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ কিনা ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে এই সব পুঁথি থেকেই কতকটা অনুমান ক'র্‌তে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে রচা অনেক বই ষোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে ; এই সব নকলে একটু-আধটু (কোথাও বা অনেকখানি) মূল থেকে ব'দ্‌লে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২।৩ শ' বছর পরে নকল-করা তার যে পুঁথি পাওয়া যায়, সে পুঁথি থেকে মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'র্‌ত তারা তো আর ভাষাতাত্ত্বিক ছিল না, যে অবিকল নকল কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে ; আর সে ইচ্ছা থাক্‌লেও তারা মানুষ ছিল, কল ছিল না—তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাক্‌ত না, ব'দ্‌লে যেত' ; ফলে অবশ্য ভাষা নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে যেত'। কাজেই যে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। জলের দেশ বাঙলা, কাগজ সহজেই পঁচে যায়, তালপাতার কালির দাগ ধুয়ে' মুছে' যায় ; তা' ছাড়া উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর পোড়া আছে, বন্যা আছে, আর আছে অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের যত্নের অভাব। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা দুর্ঘট। ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া যায়। যে দু'চার খানি পাওয়া যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী। পনেরো শ' খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ল্‌লেই হয়। সুতরাং পনেরো শ' সালের

আগেকার বাঙলার স্বরূপ জানবার জন্তে পরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ ১৬।১৭ বা ১৮ শ' সালের দিকে নকল-করা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। অনুমান হয় যে চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ-পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর দু' এক শ' বছর পূর্ব্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পরে হ'চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০-এর আগেকার লোক। কিন্তু এঁদের সময়ের পুঁথি নেই—পরবর্ত্তী বিকৃত পুঁথিই এঁদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক'র্‌তে গেলে এই কথাটাই সব প্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্ব্বেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন ক'রেই ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে। এখানে এই বস্তুর দৈন্যটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটা সত্য সত্য কি ছিল তা' জান্‌তে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্য্য বা ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ১৩ শ' বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ' সালের আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার অবিসংবাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয় গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা খুব আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়।

(৪)

তারপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে হ'য়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের

সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে,- অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের চতুর্থ পাদের পূর্ব্বে, সবই অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। তার পূর্ব্বে অবশ্য বাঙালী গান বাঁধ্‌ত, কাব্য লিখ্‌ত, কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে' গিয়েছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে দু'-একটা নাম পাওয়া যায় মাত্র—যেমন ময়ূরভট্ট, কাণা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এঁরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এঁদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এঁরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমন্তের কথা,—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতন এগুলি সুপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে পৈতৃক রিকৃথ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ্ নয়। দেখ্‌ছি যে চণ্ডীদাসের পরে এই সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ'য়েছে। এই কাব্যগুলির আদি-রূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; —কিন্তু এটা একটা প্রমাণ-সাপেক্ষ অনুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেকার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক বাঙলা গান আর ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে গিয়ে একটা কাল্পনিক বৌদ্ধ-যুগ খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ'ড়তে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু ঐ কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন-তারিখ, এমন কি 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি ক'টাও নিতান্তই কাল্পনিক।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা—অর্থাৎ ১৬ শ' বা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের পুঁথির অভাব,—বাধ্য হ'য়ে

বহুদিন ধ'রে আমাদের এই অবস্থাতেই আট্‌কে থাক্‌তে হ'য়েছিল ; অথবা কল্পনা দিয়ে তার আগেকার ফাঁক পুরিয়ে' নেবার 'ঐতিহাসিক' আর 'সাহিত্যিক' অনুসন্ধান চ'ল্‌ছিল। কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর দশেক হ'ল দু'খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যে দু'খানিতে আমরা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই দু'খানি হ'চ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চর্য্যাপদ। প্রথমখানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন ; বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে, গোয়ালঘরের মাচার উপরে এক ধামার ভিতরে আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিষটী ছিল। বসন্ত-বাবুকে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ঘুণ বলা হ'য়েছে, এটী তাঁর যথাযথ বর্ণনা, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানি না। তিনি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি-শালার কর্ত্তা ছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে প্রকাশ করা হ'য়েছে। পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লিপি-বিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই। দু' একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন ; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের কিছুতেই হ'তে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মাত্র দু'-একটার সঙ্গে এর পদের মিল পাওয়া যায়। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর সাধারণতো অর্দ্ধশিক্ষিত আঁখরিয়া বা নকল-নবীশের হাতে প'ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪।৫ শ' বছরের মধ্যে যে ব'দলে যাবে তা নিঃসংশয়। কেউ-কেউ বলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন; আবার কারো মতে দুই-এর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন। এটা খুবই সম্ভব; কিন্তু এখন সে কথায় আমাদের কাজ নেই—কারণ আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা ১৪ শতকের লেখা মূল পুঁথি পাচ্ছি. এতে ঐ যুগের ভাষা—সাহিত্য বা গানের ভাষা—পাওয়া যাচ্ছে; যার-ই লেখা হোক্ না কেন', ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষায় ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০।২০০ বছর আগেকার দলিল মিল্‌ল, তার ইতিহাসের বনিয়াদ আরও পাকা হ'ল।

তারপর চর্য্যাপদের কথা ধরা যাক। ১৩২৩ সালে মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়' নাম দেওয়া এক খানা পুথি অন্য তিন খানা পুথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়ে'

প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চার খানি পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর বিশেষ স্থান আছে।—অন্য তিন খানির ভাষা বাঙলা নয়, সুতরাং সেগুলির বিষয় এখানে এখন কিছু ব'ল্‌বো না। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে চর্য্যা বা চর্য্যাপদ বা পদ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্‌তে হয়; আর এই গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হ'চ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে এক রকম মানে, তার কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক—যারা ঐ সাধন-পথের গুহ্যতত্ত্ব জানে না—তাদের পাওয়া কঠিন। যে পুথিতে চর্য্যাপদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির চেয়ে বেশী নয়; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হ'য়েছে যে, এই গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চেয়ে অন্ততঃ দেড় শ' বছর আগে-কার;—দু'-চারটী বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, যাঁরা এই গান লিখেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব চেয়ে প্রাচীন বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক উঠেছে, এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা সত্যি-সত্যি বাঙলা কিনা। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন তুলেছেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে

পক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে চর্য্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত এই দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা বাঙলা-ই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে এতে পশ্চিমা-অপভ্রংশের দু'-চারটে রূপ এসে গিয়েছে, তাতে এর ভাষার 'বাঙলা-ত্ব' যায় না। চর্য্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার আর একটী মূল্যবান্ দলিল বা'র হ'ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার করবার উপযুক্ত বস্তু মিল্‌ল— মোটামুটী খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল পর্য্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল।

(৫)

এর পূর্ব্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই না। খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বে বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তখন অবশ্য বাঙলা ভাষা বা তার আদিম-রূপ হিসেবে একটা কিছু বিদ্যমান ছিল,—কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো-একটা পাচ্ছি না। আগে হিন্দু-আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ক'রতেন। এই সব দান, দলিল ক'রে দানপত্র ক'রে দেওয়া হ'ত। দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্ছন বা চিহ্ন থাকৃত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলাদেশে যা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে সেটী

হ'চ্ছে উত্তরবঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত-সম্রাট্ কুমারগুপ্তের সময়ের ; এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩ ; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান-যুগ পর্য্যন্ত, আর তার পরবর্ত্তী কালেরও অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে ; মুসলমান-পূর্ব্বযুগের বাঙলাদেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্রশাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে দানের ভূমির পরিমাণ, গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর বর্ণনা কর্‌বার সময় মাঝে মাঝে দু'-চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার—অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার—নামও র'য়ে গিয়েছে। সেগুলিকে কোথাও কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে, দুই-একটী উপসর্গ বা প্রত্যয় তাদের আগে-পিছনে জুড়ে দিয়ে' বাহ্যতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে ; কিন্তু এই সাজের মধ্যে থেকেও তাদের প্রাকৃত রূপটীকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বকালের বাঙলাদেশের ভাষা আলোচনা কর্‌বার একটী সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। 'কণামোটিকা' অর্থাৎ কিনা কানামুড়ী, 'রোহিতবাড়ী' অর্থাৎ রুইবাড়ী, 'নড়জোলী' অর্থাৎ নাড়াজোল, 'চবটীগ্রাম' অর্থাৎ চটীগাঁ, 'সাতকোপা' অর্থাৎ সাতকুপী, 'হড়ীগাঙ্গ' অর্থাৎ হাড়ীগাঙ্‌ প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্ত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাকৃতশ্রেণীর একটী ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষার এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা (অবশ্য একটু পরিবর্ত্তিত রূপে) আজকালকার বাঙলায়

ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে একটী বিষয় চোখে পড়ে; অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোন আর্য্যভাষা ধ'রে হয় না,—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্য্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। 'অঝডাচোবোল, দিজমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডারবীটিজোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী' প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্য্যভাষার নয়; আর 'পোল' বা 'বোল', 'জোটী', 'জোড়ী' বা 'জোলী', 'হিট্টা' বা 'ভিট্টা', 'গড্ড' বা 'গড্ডী' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এইগুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য্য শব্দ দেখে, দেশে অনার্য্যদের বাস অনুমান ক'র্‌লে কেউ ব'ল্‌বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।

কিন্তু এই সব নাম তো ভাষার পূরো পরিচয় দেয় না; কাজেই বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্য্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেক্‌তে হয় একেবারে মাগধী-প্রাকৃতে। এই ভাষায় সংস্কৃত নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথা বলানো হ'ত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী-প্রাকৃত বা অন্যান্য প্রাকৃতের তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী-প্রাকৃত-সম্বন্ধে দুটো কথা ব'লে গিয়েছেন। বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন; খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কোনও

সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন মনে হয়। বররুচি যে মাগধী-প্রাকৃত আলোচনা ক'রেছেন, সেটী হ'চ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা,—যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে কথাবার্ত্তা ব'লত, এরূপ ভাষা নয়; বরং তার-ই দুই-একটা বিশেষত্বকে ধ'রে গ'ড়ে তোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা একটী ভাষা। যাই হোক, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী অন্ততো কতকটা কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী ভাষা, বররুচির আগে আর বররুচির পরেও, পূর্ব্ব-ভারতে মগধে কাশী বিহার অঞ্চলে বলা হ'ত। আর খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা-দেশে তখন যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধী-ই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্ত্তমান বাঙলা ভাষা, বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয়নি। এই মাগধী-প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণগত একটী বিশেষত্ব ছিল, যা এর দৌহিত্রীস্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'র্‌ছে—সেটী হ'চ্ছে ভাষার 'শ ষ স' স্থানে কেবল 'শ'। মাগধী-প্রাকৃতের পূর্ব্বে এই দেশের আর্য্যভাষা যে অবস্থায় ছিল, তার পরিচয় পাই অশোকের অনুশাসনে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। স্থানভেদে অশোকের অনুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহ্‌বাজ্‌গড়ী আর মান্‌সেহ্‌রার পাহাড়ের অনুশাসনের ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গির্‌নার অনুশাসনে আর একরকম, আবার পূর্ব্ব-ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্যরকমের প্রাকৃতে লেখা। অশোকের

পূর্ব্ব-ভারতীয় অনুশাসনাবলীর ভাষা—দু'-একটী খুঁটীনাটী বিষয়ে ছাড়া—পরবর্ত্তী কালের বররুচি কর্ত্তৃক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী-প্রাকৃতের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পূর্ব্বী-প্রাকৃতকে, মাগধী-প্রাকৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ব'লে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, বাঙলা ভাষার মূল, মাগধী-প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পূর্ব্বী অশোক-অনুশাসনের ভাষায় গেলে পাওয়া যায়। এই অশোকের পূর্ব্বী-প্রাকৃতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে ভবিষ্যৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, অপরিস্ফুট মাত্র। বাঙলা ভাষা এই পূর্ব্বী-প্রাকৃতের একটী বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের উপর লেগেছিল। অশোক-যুগের আগে পূর্ব্ব-ভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার আর নিদর্শন মেলে না; তবে তার সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য থেকে আর সংস্কৃত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ থেকে একটু-একটু আন্দাজ ক'র্‌তে পারি। অশোক বা মৌর্য্যবংশের পূর্ব্বে খুব সম্ভব বাঙলা-দেশে আর্য্যভাষার বিস্তার হয়নি। বুদ্ধদেবের সময়েও বোধ হয় মগধ আর চম্পার পূর্ব্বদিকে আর্য্যভাষা আসেনি। বুদ্ধ-দেবের সময় হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ-যুগের অবসান কালে। এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫০০-র দিকে, ভারতে কথিত আর্য্যভাষা দেশ-ভেদে তিনটী ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছিল—[১] উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এখনকার যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম অংশে) বলা হ'ত; আর [৩] প্রাচ্য—কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। এই প্রাচ্য-আর্য্যই কালে অশোক-যুগের পূর্ব্বী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে মাগধী-প্রাকৃতে পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা

তার আগেকার এই প্রাচ্য ভাষা, বৈদিক ভাষার একটী অর্ব্বাচীন রূপ মাত্র।

বৈদিক সময় থেকে আর্য্যভাষা তা-হ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা ঐ পথের সম্বন্ধে পর পর এই নির্দ্দেশ পাচ্ছি :—

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ঋগ্‌বেদের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর আগেকার কালের বৈদিক সূক্তে এই ভাষার মার্জ্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ-সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্‌বেদে আর পরবর্ত্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

[২] তারপর আর্য্যভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর-ভারতে, গঙ্গা-যমুনার দেশে, যুক্ত-প্রদেশে, আর বিহার-অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, খ্রীঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে। এই সময় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'র্‌লে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর পশ্চিম-অঞ্চলে কথিত রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর পূর্ব্ব-অঞ্চলের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে কিছু-কিছু আভাস পাই; তা' থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, পূর্ব্ব-অঞ্চলে যে আর্য্যভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতেই আদি-যুগের আর্য্যভাষার ভাঙন ধরেছিল; প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব্ব-দেশেই হয়। পূর্ব্ব-দেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—'বিকট, ক্ষুল্ল, শিথিল, মল্ল, দণ্ড, পিল্' প্রভৃতি।

[৩] এর পরে দেখি, প্রাচ্য-অঞ্চলের এই ভাষা, পুরোপুরি প্রাকৃত রূপ নিয়ে', দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে :—এক, পশ্চিম খণ্ডের প্রাচ্য ; আর দুই, পূর্ব্ব খণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটার 'মাগধী' এই নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা-প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্ব্বী-প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা-প্রাচ্যের তফাৎ খালি এই জায়গাটায় যে, পূর্ব্বীতে সব জায়গায় তালব্য 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু তালব্য 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য 'স'-র ব্যবহার ছিল। দু' একটা ছোটো শিলা- আর মুদ্রা-লেখে এই পূর্ব্বী-প্রাচ্য বা মাগধী-প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক-যুগের ; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের সুতনুকা-লিপি সব চেয়ে মূল্যবান্। খুব সম্ভব খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে, মৌর্য্যদের কালে, এই পূর্ব্বী-প্রাচ্য বাঙলাদেশে তার জড় গাড়্‌তে সমর্থ হয়।

[৪] পরবর্ত্তী কালের এই মাগধী প্রাকৃতের একটা সাহিত্যিক নিদর্শন পাই—সংস্কৃত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে এই প্রাকৃতের যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছিল অনুমান করা যায়।

[৫] তারপর কয় শতাব্দী ধ'রে সব চুপ্-চাপ,—বাঙলা দেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চ্চার কোনও চিহ্ন নেই—তাম্র-শাসনের দু'-একটা নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধী-প্রাকৃত আস্তে-আস্তে ব'দ্‌লে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহী), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে পরিণত হ'চ্ছিল।

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলা ভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে' দিলে—১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, চর্য্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হ'ল।

[৭] তারপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, তুর্কীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলাদেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু' শ' বছর ধ'রে বাঙলা ভাষার কোনও খোঁজ্-খবর নেই। বোধ হয় অশান্তি আর অরাজকতা তখন দেশব্যাপী হ'য়ে ছিল। তারপরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের আবির্ভাব, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা অনেকটা পরবর্ত্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তার পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়ো-দরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা দাঁড়িয়ে' গেল, তখন থেকে বাঙলা ভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে ক'টা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সেগুলো কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি? ভাষার ক্রমিক বিবর্ত্তন দেখাতে হ'লে সেগুলোকে টপ্‌কে' বা ডিঙিয়ে' তো যাওয়া যেতে পারে না, কারণ সে সমস্ত যুগের মধ্যে দিয়েও ভাষা-স্রোত অব্যাহত গতিতে চ'লে এসেছে।—এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আগেই ব'লেছি যে, মাগধী-প্রাকৃতের কাল থেকে চর্য্যাপদের কাল, মোটামুটী খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক—এই সাত শ' বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ' বছরের ইতিহাস তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক'র্‌তে পারা যায়? এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী-প্রাকৃত কোন্ ধারায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে?—সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী-প্রাকৃতে সমকালীন আর তার স্বস্থ-স্থানীয় শৌরসেনী-প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শৌরসেনী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে, তাই দেখে'। শৌরসেনী-প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত; বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বররুচির ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্ত্তী যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে, পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মের নিয়ম-অনুসারে অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করে; আর, একটী নাতিবৃহৎ গীতি-কাব্যসাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্ব্বাচীন অবস্থা আমরা দেখ্‌তে পাই। পরবর্ত্তী যুগের এই শৌরসেনীকে 'শৌরসেনী-অপভ্রংশ' বা খালি 'অপভ্রংশ' বলা হয়। শৌরসেনী-অপভ্রংশ হ'চ্ছে, একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আর্য্যভাষা হিন্দী, এই দুইয়ের সন্ধি-স্থল। শৌরসেনী-অপভ্রংশ থাকায় বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে কিরকম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ'ল। এখন, যদি মাগধী-প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে (শৌরসেনী-অপভ্রংশের মতন) উভয়ের সংযোগ-স্থল এক 'মাগধী-অপভ্রংশ'র নিদর্শন পেতুম,—'মাগধী-অপভ্রংশ' নাম যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোনো সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে থাকৃত, তা-হ'লে বাঙলার

উৎপত্তি নির্দ্ধারণ কর্‌বার উপযোগী কতটা-না মাল্‌-মশলা আমাদের হাতে আস্‌ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তুর্কী-বিজয়ের পূর্ব্বে সাত শ' বছর ধ'রে বাঙলাদেশের পণ্ডিতেরা দেশ-ভাষার দিকে নজর দেন নি, তাতে কিছু লেখেন নি, সব লিখেছেন দেব-ভাষা সংস্কৃতে ;—আর চিত্ত-বিনোদনের জন্য বা দেবতার আরাধনার জন্য ভাষায় জন-সাধারণ যে গান কবিতা আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখ্‌ত, সেগুলি সব লোপ পেয়েছে। ভাষার ইতিহাস আলোচনার যুক্তি-অনুসারে, মাগধী-প্রাকৃত আর বাঙলা ভাষা এই দুয়ের সন্ধি-স্থল-স্বরূপ একটা মাঝের অবস্থা আমাদের স্থাপিত ক'র্‌তে হয়, আর তাকে 'শৌরসেনী-অপভ্রংশ'-র নজীরে 'মাগধী-অপভ্রংশ' নাম দিতে হয়। আর যুক্তি-তর্ক আর ভাষাতত্ত্বের নিয়ম খাটিয়ে' পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার ক'রে এই মাঝের অবস্থার, আমাদের কল্পিত এই মাগধী-অপভ্রংশের, রূপটা কি রকম ছিল তা-ও আমাদের স্থির ক'র্‌তে হবে। অবশ্য যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি তাঁদের চোখে এই ব্যাপারটা একটু জটিল ঠেক্‌বে, কিন্তু এটা হচ্ছে ভাষাতত্ত্বের সকল নিয়ম-কানুন বা সূত্র বা পদ্ধতির অনুমোদিত পথ। সূত্র যেখানে ছিন্ন, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে', ছিন্ন অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নি'য়ে অবিচ্ছিন্ন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে।

বাঙলার বংশপীঠিকা তা-হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বৈদিক কথিত ভাষার রূপভেদ > প্রাচ্য-অঞ্চলের কথিত ভাষা > কথিত মাগধী-প্রাকৃত > মাগধী-অপভ্রংশ > প্রাচীন বাঙলা > মধ্যযুগের বাঙলা > আধুনিক বাঙলা। বাঙলা ভাষার ইতিহাস চর্চ্চা ক'র্‌তে

হ'লে এই কয় ধাপের প্রত্যেকটীর স্থান আর বৈশিষ্ট্য বেশ ক'রে বুঝে' নিয়ে' এদের সঙ্গে পরিচয় দর্‌কার। মানসিক চিন্তার বিষয়ীভূত হলেও, ভাষা মুখ্যতো একটী প্রাকৃতিক বস্তু; আর প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কার্য্যকারণাত্মক নিয়ম ধ'রেই হয়ে'ছে, সে কথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বল্‌বার স্থান এ নয়,—তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে দু'টী ছত্র উদ্ধার ক'রে, বাঙলা ভাষার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কিরকম ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখাবার প্রয়াস করা গেল। ছত্র দু'টী 'সোনার তরী' কবিতা থেকে নেওয়া সর্ব্বজন-পরিচিত ছত্র—'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।' আলোচনার সুবিধার জন্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ 'তরী'-কে বাদ দিয়ে তার জায়গায় নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ 'না'-কে বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ 'উহারে'-কে বর্জ্জন ক'রে আধুনিক 'ওরে'-কে নেওয়া হ'ল। (নীচে বাঙলার পূর্ব্বেকার স্তর হিসাবে যে পুনর্গঠিত রূপ দেখানো হ'চ্ছে, তাতে কোনও পদের পূর্ব্বে * বা তারকাচিহ্ন দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে যে সেই পদ কোনও বইয়ে মেলে নি, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে সেইরকম পদের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস ক'রতে হয়—এইরূপ সম্ভাব্য রূপের আধারের উপর পরবর্ত্তী প্রয়োগ প্রতিষ্ঠিত।)

আধুনিক বাঙলা	গান্‌ গেয়ে না বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন (জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওরে।

মধ্যযুগের বাঙলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)

গান্ গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে আস্তে (আইসে) পারে, দেখ্যা (দেইখ্যা) *জেন্‌হ (জেন্‌হ, জেহেন) মনে হোএ, *চিণ্হী (চিন্‌হীয়ে) *ওআরে (ওহারে)।

প্রাচীন বাঙলা (আনুমানিক ১১০০খ্রীঃ)

গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারহি, দেখিআ *জৈহণ মণে (মণহি) হোই, *চিণ্হিঅই *ওহারহি।

***মাগধী-অপভ্রংশ (আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ)**

গাণ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ *কই (*কি) আবিশই পারহি (পালহি), দেক্‌খিঅ *জইহণঁ (জইশণঁ) মণহি হোই, *চিণ্হিঅই *ওহঅরহি (*ওহঅলহি)

মাগধী-প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ)

গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) *কগে (*কএ, বা কে) আবিশদি *পালধি (পালে), দেক্‌খিঅ (দেক্‌খিত্তা) *জাদিশণং *মণধি হোদি (ভোদি), চিণ্হিঅদি *অমুশ্‌শ কলধি (=অমুশ্‌শ কদে)।

***আদিযুগের প্রাচ্যপ্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০খ্রীঃ পূঃ)**

গানং গাধেত্বা নাবং বাহেত্বা *ককে (কে) আবিশতি *পালধি (পালে), দেক্‌খিত্বা যাদিশং (*যাদিশনং) *মনধি (মনসি) হোতি (ভোতি), চিণ্হিয়তি অমুশ্‌শ কতে।

বৈদিক (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ) { গানং গাথয়িত্বা নারং বাহয়িত্বা *ককঃ (=কঃ) আরিশতি *পারধি (=পারে), *দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) যাদৃশম্ *মনোধি (মনসি) ভরতি, *চিহ্যতে অমুষ্য কৃতে (=অসৌ অস্মাভির্ জ্ঞায়তে)।

এর পূর্ব্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে যে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থা বা স্তর-গুলিকেও আমরা প্রাচীন ইরানীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্টিক, শ্লাভ, আর জার্ম্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠন ক'র্‌তে পারি।

সাধারণ ভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধে দুটো মোটা কথা ব'ল্‌লুম। এ ছাড়া, বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,—যেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্‌লে কি বুঝ্‌তে হবে; বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান কি প্রকারের, আর কতটা; বাঙলা ভাষার উপর অনার্য্য প্রভাব; মুসলমান আর বাঙলা ভাষা; বাঙলা ভাষার আধুনিক গতি আর তার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশা-আশঙ্কা;—এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় নেই। আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। যে-যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক'র্‌লুম, সে সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। সে সম্বন্ধে কিছু বিচার ক'র্‌তে গেলে বা মত দিতে হ'লে, বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আর বাঙলা ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সে-কথা সকলেই স্বীকার ক'র্‌বেন।

(৬)

এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালী জা'তের আর সভ্যতার উৎপত্তি-সম্বন্ধে গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'র্‌বো। নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চ'ল্‌ছে। কিন্তু নৃতত্ত্ব-বিদ্যা যে কালের কথা নিয়ে' আলোচনা ক'র্‌ছে, সেটা হ'চ্ছে এক রকম প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। বাঙালী জা'তের সৃষ্টিতে এই কয়টী বিভিন্ন মূল জা'তের উপাদান নাকি এসেছে :— [১] লম্বা আর উঁচু-মাথা-ওয়ালা একটী জাতি—North Indian 'Aryan' Longheads : এই জা'তটাই হ'চ্ছে আর্য্য-ভাষী জাতি, এই হ'ল অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদের মত—পাঞ্জাবে, রাজপুতানায়, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটী খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় ; কিন্তু বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক বেশী মেলে না, অতি অল্প-স্বল্প যা কিছু পাওয়া যায়। [২] লম্বা আর নীচু-মাথা-ওয়ালা একটী জাতি—South Indian or Dravido-Munda Longheads : আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড়-ভাষীরা, আর কোল-জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাঙলাদেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। [৩] গোল-মাথা ওয়ালা একটী জাতি—Alpine Shortheads : এদের সরল নাক, মুখে দাড়ী-গোঁফের প্রাচুর্য্য ; সিন্ধুদেশে, গুজরাটে, মধ্য-ভারতে, কর্ণাটকে, অন্ধ্রেও এদের বাস ছিল, এইরূপ মস্তকাকৃতির লোক ওই সব দেশে এখনও বেশী ক'রে দেখা যায় ; বাঙলাদেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুর্য্য

বেশী, বিশেষ ক'রে ভদ্রজাতির মধ্যে ;—সাধারণ বাঙালী গোল-মাথা-ওয়ালা, পাঞ্জাবীদের মতন লম্বা-মাথা-ওয়ালা নয় ; এই গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি আদিম অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্ব্বে, ভাষায় আর সভ্যতায় কি ছিল তা এখনও জানা যায় নি,—আর এরা কবে কোথা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল তা-ও জানা যায় নি ; তবে এদের অনুরূপ গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহু দেশে পাওয়া যায়। [৪] গোল-মাথা-ওয়ালা আর একটী জাতি—Mongolian Short-heads : এরা মোঙ্গোল জাতীয় লোক, নাক চেপ্‌টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফ-দাড়ী কম ; উত্তর- আর পূর্ব্ব-বঙ্গের বাঙালা জনসাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এই চার প্রকার জা'তের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী। এই চার জা'ত ছাড়া, দক্ষিণ-ভারতের আর এশিয়ার অন্যান্য ভূভাগের মতন বাঙলাদেশে Negrito নিগ্রোবটু বা Negrillo নিগ্রিল পর্য্যায়ের জাতির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ মেলে না ; বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব সম্ভব নেই। Risley রিজ্‌লী-প্রমুখ দুই একজন নৃতত্ত্ববিৎ মনে ক'র্‌তেন যে প্রধানতো [২] আর [৪]-এর সংমিশ্রণ হওয়ায় গোল-মাথা ওয়ালা বাঙালী জাতির উৎপত্তি। কিন্তু এই মত এখন সকলে মানেন না।

যাই হোক্‌, উপরে নির্দ্দিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টির উদ্ভব—এটা হ'চ্ছে মোটামুটীভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার আবিষ্কার। এতে ভাষা- বা সভ্যতা-সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল না—খালি মানুষের দেহের সমাবেশ নিয়ে

তার মৌলিক জা'ত স্থির কর্‌বার প্রয়াসের উপর এই আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত। [১]-শ্রেণীর লোকেরা-ই যে বৈদিক আর্য্যভাষী,— উত্তর-ভারতের পাঞ্জাবে রাজস্থানে যুক্ত-প্রদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্ব্বপুরুষ, এটা এখন একরকম সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু বাঙালীর মধ্যে, এমন কি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও, এই শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—এটা একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। [২]-শ্রেণীর লোকেরা যে তামিল- আর কোল-ভাষী জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ, এটাও মানা হয়। বাঙলাদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এইরূপ আকৃতি পাওয়া যায়, একথা আগেই ব'লেছি। [৪]-শ্রেণীর লোকেরা, বাঙলা-ভাষী হ'য়ে বাঙালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পূর্ব্বে, অন্ততো বেশীর ভাগ যে ভোট-চীনা-গোষ্ঠীর ভাষা ব'ল্‌ত সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার বিশেষ কিছু নেই।

খালি মুষ্কিল হ'চ্ছে [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের নিয়ে'। এদের ভাষা কি ছিল? দ্রাবিড়, না কোল, না আর্য্য, না ভোট-চীনা—না অধুনা-লুপ্ত আর কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা? ভারতে অধুনা বিদ্যমান এই চারটী ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে খুব সম্ভব কোল ভাষা সব চেয়ে আগেকার কাল থেকে ভারতবর্ষে বলা হ'ত, এইরূপ অনুমান হয়; দ্রাবিড় ভাষা তার পরে আসে, আর তার পরে আর্য্য আর ভোট-চীন। এই চারটী গোষ্ঠী ব্যতিরেকে পঞ্চম কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নি। হয়-তো পরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের ভাষা-সম্বন্ধে এখন কি অনুমান করা যেতে পারে? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ

চন্দ মহাশয় তাঁর Indo-Aryan Race নামক অতি মৌলিক তথ্যপূর্ণ নৃতত্ত্ববিদ্যা-বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন যে, আমাদের [৩]-শ্রেণীর এই Alpine Shortheads-রা, [১]-শ্রেণীর লোকেদের মত আর্য্যভাষী-ই ছিল ; আর তাঁর এই মত বিদেশেরও নৃতত্ত্ববিৎ কেউ-কেউ গ্রহণও ক'রেছেন। কিন্তু এই মত সকলের মনঃপূত হয় না। আমার মনে হয়—আর এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারো কারো মতও আমার অনুকূল—যে এই [৩]-শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আর্য্য বা মোঙ্গোলদের ভাষা ব'ল্‌ত না —সম্ভবতো তারা দ্রাবিড় বা কোল ব'ল্‌ত, কিংবা তারা অধুনা-লুপ্ত অন্য কোনও অনার্য্য ভাষা ব'ল্‌ত। গঙ্গা ব'য়ে আর্য্য আর গাঙ্গেয় সভ্যতা ঐতিহাসিক যুগে, অর্থাৎ যে যুগের খবর মানুষের লেখা বইয়ে আমরা পাই সেই যুগে গঠিত আর পুষ্ট হ'য়েছিল ;—আর্য্যভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার সংযুক্ত-প্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [১]-শ্রেণীর ঔপনিবেশিকের মুখে বাঙলাদেশে প্রসৃত হবার পূর্ব্বে, বাঙলাদেশে [২], [৩] আর [৪]-শ্রেণীর যে অধিবাসীরা বাস ক'র্‌ত, তারা যে আর্য্য-ভাষী ছিল না, এ কথা ব'ল্‌লে অযৌক্তিক কথা বলা হয় না। বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি যে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি থেকেই হোক্, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে তা' থেকে তারা (উত্তর-ভারত থেকে আর্য্যভাষার আগমনের পূর্ব্বে) অনার্য্য-ভাষী ছিল ব'লেই অনুমান হয়। যে সব আর্য্য-ভাষী লোক উত্তর-ভারত আর বিহার থেকে বাঙলায় আসে, তারা সকলেই বিশুদ্ধ [১]-শ্রেণীর লোক ছিল না—কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বা ছত্রী বা পাঞ্জাবীদের

মতন তারা সকলেই লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক ছিল না, একথাও ব'ল্‌তে হয়। কারণ উত্তর-ভারত থেকে ভাষায় আর্য্য কিন্তু উৎপত্তিতে অনার্য্য বহু লোকও বাঙলাদেশে এসেছিল। সে যাই হোক্—বাঙলাদেশে আর্য্যভাষার আগমনের পূর্ব্বে, কোল আর দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব্ব-অঞ্চলে ভোট-চীন, এই তিন ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই—গোল-মাথা Alpine Shorthead-দের মধ্যে অন্য কোনও ভাষা ছিল কিনা জান্‌বার উপায় নেই। এটা অসম্ভব নয় যে তারা [১]-শ্রেণীর আর্য্যদের আস্‌বার আগে, [২]-শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড় গ্রহণ ক'রেছিল; আর বাঙলা-দেশের প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীন ছাড়া অন্য ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [২]-শ্রেণীর লোকেরা, আর্য্যদের আগমনের কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়—এর বিরুদ্ধে অন্য কোনও যুক্তি মনে লাগে না। সমস্ত উত্তর-ভারতময়—বাঙলাদেশকেও ধ'রে—দ্রাবিড়- আর কোল-ভাষী লোকেদের অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে;—কিন্তু কোল-দ্রাবিড়ের বাইরে, আর ভোট-চীনা ছাড়া, অন্য কোনও অনার্য্য ভাষার বিদ্যমানতা-সম্বন্ধে প্রমাণের আর যুক্তির একান্ত অভাব।

এখন এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব আর ইতিহাস আমাদের কতটা সাহায্য করে দেখা যাক্।

আমাদের প্রাচীনতম বই বেদ থেকে আর্য্য, আর অনার্য্য, এই দুই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের কথা জান্‌তে পারি। আধুনিক ভারতেও এই পার্থক্যটুকু প্রচ্ছন্ন বা প্রকট অবস্থায় এখনও বিদ্যমান

আছে—দৈহিক গঠনে, বর্ণে, মানসিক প্রবণতাতে, রীতি-নীতিতে, আর কচিৎ ভাষায়। বহু শতাব্দী ধ'রে এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে, মূল পার্থক্যটুকু অনেকটা চ'লে গিয়ে দুই প্রকৃতি মিশে' নোতুন একটী প্রকৃতির সৃষ্টি হ'য়েছে, তা'তে দুই মূল উপাদানের পার্থক্য সহজে ধ'র্‌তে পারা যায় না। আর্য্য আর অনার্য্য হ'চ্ছে টানা আর প'ড়েনের সুতো, এই দুইয়ের যোগে তৈরী হ'য়েছে আমাদের হিন্দু জাতি, ধর্ম্ম আর সমাজের ধূপ-ছায়া বস্ত্র। আর্য্যেরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ কথা যাঁরা ধর্ম্ম আর স্বজাতি-প্রীতির সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে' ফেলেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেই এখন মানেন। ভারতে আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে দু'টী বড়ো অনার্য্য জা'ত বাস ক'র্‌ত—দ্রাবিড় আর কোল। আর্য্যেরা এল' পূর্ব্ব-পারস্য হ'য়ে ভারতবর্ষে—কোন্ দেশ থেকে তারা এল, তা আমরা জানি না। তবে অন্ততো ভাষায় আর সভ্যতায় যারা তাদের জ্ঞাতি, এমন সব জা'ত পাওয়া যায় পারস্যে, আর্ম্মেনিয়ায় আর ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র। কেউ কেউ অনুমান করেন, আদি আর্য্যদের বাস ছিল দক্ষিণ-রুষিয়ায়; কারো মতে জার্ম্মানীতে; কেউ বা বলেন, লিথুআনিয়ায়; কেউ বা বলেন হঙ্গেরীতে;—আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের ইতিহাসে পড়া মধ্য-এশিয়াকে এখন অনেকেই মানেন না। সে যা হোক্, আর্য্যেরা ভারতে এল', তাদের বৈদিক ভাষা, তাদের বেদের কবিতা, তাদের ধর্ম্ম, তাদের সামাজিক বিধি-নিয়ম, আর তাদের প্রচণ্ড সংঘ-বদ্ধ শক্তি নিয়ে'। তাদের কতক অংশ পারস্যেই র'য়ে গেল। ভারতে এসে' প্রথমটা পাঞ্জাবে তাদের বাস হ'ল

দেশটা কিন্তু খালি ছিল না; এখানে 'সুসভ্য 'দাস' বা দ্রাবিড় জা'ত বাস ক'র্‌ত; আর, তাদের তুলনায় বোধ হয় কিছু কম সভ্য, কোলেরাও ছিল,—সমস্ত দেশটা জুড়ে-ই ছিল। আর্য্যেরা আসতে তারা সসম্ভ্রমে দেশ ছেড়ে দিয়ে' চ'লে গেল না, মাতৃভূমি-রক্ষার জন্যে দাঁড়াল। প্রথমটা আর্য্য-অনার্য্যের সংঘাত ঘ'ট্‌ল, আর এই সংঘাতে পাঞ্জাবে আর্য্যেরাই জয়ী হ'ল, কিন্তু সিন্ধুদেশের সুসভ্য অনার্য্যের কাছ থেকে (ভাষায় এরা কি ছিল এখনও তা জানা যায় নি) আর্য্যেরা এমনি বাধা পেলে যে তারা বহু শতাব্দী ধ'রে ওদিকে আর এগোলো না, পূব দিকে গঙ্গা-যমুনার দেশের দিকেই ছড়িয়ে' পড়্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লে। আর্য্যেরা তো অনার্য্যদের দেশ দখল ক'রে তাদের উপর রাজা হ'য়ে ব'স্‌ল। যদিও অনার্য্যেরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না, তবু আর্য্যের তীব্র আক্রমণে তাদের জাতীয় সংহতি-শক্তির নাশ হ'ল। তারা সব বিষয়ে আর্য্যদের প্রভু ব'লে মেনে নিলে, তাদের ভাষা নিলে, তাদের ধর্ম্ম নিলে। কিন্তু আর্য্যেরা ছিল সংখ্যায় কম, তারা নিজেরাও অনার্য্যের প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত থাক্‌তে পার্‌লে না। অনার্য্যের ধর্ম্মের আর মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আর্য্যদের মধ্যেও এল'। অনার্য্যদের ভাষার অনেক শব্দ আর্য্যেরা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনার্য্যেরা যখন দলে দলে আর্য্যের ভাষা গ্রহণ ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তখন তাদের মুখে আর্য্য-ভাষা স্বভাবতো-ই ব'দ্‌লে গেল; বিশুদ্ধ জাত্‌ আর্য্যদের ব্যবহৃত আর্য্য-ভাষাও অনার্য্যের বিকৃত আর্য্য-ভাষার ছোঁয়াচে প'ড়ে তার বিশুদ্ধি রাখ্‌তে পার্‌লে না।

ঋগ্‌বেদের যুগের পর আর্য্যেরা তাদের ভাষা নিয়ে' উত্তর-ভারতে বিহার পর্য্যন্ত ছড়িয়ে' প'ড়্‌ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্র-রচনার যুগের অবসান হ'ল, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের যুগ এল'। বেদের মন্ত্র-আলোচনা, যজ্ঞ-সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটী আর দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনা আর প্রাচীন কিংবদন্তী নিয়ে' এই সব ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ। পূর্ব্ব-আফ্‌গানিস্থান থেকে বিহার পর্য্যন্ত, এই বিশাল ভূখণ্ডে যে সব দ্রাবিড় আর কোল লোক বাস ক'র্‌ত, তারা আর্য্য-ভাষা নিয়ে', আর্য্যদের পুরোহিত আর আর্য্য-ধর্ম্ম মেনে নিয়ে', আর্য্য বা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। এই অনার্য্যদের রাজারা অনেক সময় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক'র্‌ত, আর সে দাবীও প্রায় গ্রাহ্য হ'ত,—ভাষা-সঙ্কট আর ধর্ম্ম-সঙ্কট যখন আর নেই, তখন আর কোনও বাধা ছিল না; আর এদের আগেকার ধর্ম্মের পুরোহিত-বংশের লোকেরাও অনেক সময় ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে' ব'স্‌ত। পূর্ব্বদিকে আর্য্য-ভাষা এগোতে লাগ্‌ল। কিন্তু খাঁটি আর্য্যদের সংখ্যা পূর্ব্ব-দেশে কখনই প্রবল ছিল না—আর্য্যীকৃত অনার্য্যের দ্বারা এই আর্য্যভাষা-প্রচারের কাজের খুব সাহায্য হ'য়েছে। খাঁটি আর্য্য তার গান্ধার বা কেকয় বা মদ্র বা কুরু-পাঞ্চালের ঘরবাড়ী ছেড়ে, বিশেষ আবশ্যক না হ'লে পূব-দেশে আস্‌ত না। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের যুগের শেষ ভাগ নিয়ে' হ'চ্ছে আরণ্যক আর উপনিষদের যুগ, তার পরই বুদ্ধদেব আর মহাবীর স্বামীর সময়। আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলাদেশে আর্য্যদের আগমন হয় নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে যে সব আর্য্যেরা প্রথম এসে বসবাস করে, তারা ঘরবাসী কৃষাণ-জাতীয় ছিল না, তারা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে'। তারা তাদের ঘোড়া গোরু ছাগল ভেড়া নিয়ে'

ঘুরে' ঘুরে' বেড়াত; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্য্যেরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্য্য-ভাষা ব'ল্‌ত, কিন্তু তাদের আর্য্য-ভাষা পাঞ্জাব আর কুরু-পঞ্চাল-অঞ্চলের আর্য্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল; আর তাদের ধর্ম্মও ছিল বৈদিক ধর্ম্ম থেকে আলাদা—খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা ক'র্‌ত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ হোম অগ্নিপূজা ইত্যাদি ক'র্‌ত না, আর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকেও মান্‌ত না। বেদ-মার্গী পশ্চিমা আর্য্যেরা এই সব কারণে তাদের ঘৃণা ক'র্‌ত, আর ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান নিন্দার কথা লিখে' গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্য্য ছিল, আর আর্য্য-ভাষা ব'ল্‌ত (যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না), ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হ'য়েছে; আর বৈদিক আর্য্যেরা এদের শুদ্ধি ক'রে বেদমার্গী ক'রে নিত' খুব;—যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত', সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য্য দ্রাবিড় লোকেদের সঙ্গে কতকটা মিশে' গিয়েছিল। সে যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্য্যেরা মধ্যদেশীয় আর্য্যদের দ্বারা স্বীকৃত বর্ণভেদ মান্‌তই না। এই ব্রাত্য আর্য্যেরা বেদমার্গী আর্য্যদের আগে মগধ-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আর এটা খুবই সম্ভব যে তারা বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌লেও, সে ধর্ম্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে নি। তাই বৈদিক ধর্ম্মের যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে দু'টী বড়ো ধর্ম্ম মত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হ'য়েছিল,—বৌদ্ধ-মত আর জৈন-মত,—সেই দু'টী মত এই মগধ-অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসার লাভ করে।

(৭)

বুদ্ধদেবের সময়ের ভারতবর্ষের আর্য্য জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা তালিকা প্রাচীন পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়; এই তালিকায় বাঙলাদেশের স্থান নেই। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেকার ঐতরেয়-আরণ্যকের এক জায়গায় এ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত আছে যে বঙ্গ-, বগধ- আর চেরপাদ-জাতীয় লোকেরা মানুষ নয়, তারা পক্ষী বা পক্ষিকল্প। এই থেকে মনে ক'র্‌তে পারা যায় যে, বাঙলার মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আর্য্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয় নি; এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রেই এদের 'বয়াংসি' বা পাখী বলা হ'য়েছে। বুদ্ধদেবের পরেকার বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হ'য়েছে যে, উত্তর-ভারতের আর্য্য ব্রাহ্মণ, বাঙলা দেশে এলে পরে তাঁকে স্বদেশে ফিরে' প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে; অনার্য্য দেশ ব'লে বাঙলার প্রতি উত্তর-ভারতের আর্য্যেরা এমনি বিরূপ ছিল। ঐ দেশের সম্বন্ধে (তখনকার দিনে তারা পশ্চিম-বঙ্গকেই ভালো রকম জান্‌ত, তাই পশ্চিম-বঙ্গের কথাই তারা ব'লে গিয়েছে) আর একটী বদ্‌-নাম এই ছিল যে, এখানকার লোকেরা ভারী রূঢ় আর অভদ্র। জৈনদের প্রাচীন বইয়ে মহাবীর স্বামীর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে, তিনি 'লাঢ়' আর 'সুব্‌ভ'. দেশে অর্থাৎ রাঢ় আর সুহ্ম দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকে তাঁর উপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।

আমার মনে হয়, মৌর্য্যেরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক'রে আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে বাঙলার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেন। মৌর্য্য যুগ থেকেই মগধের রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক, বেণে, ব্রাহ্মণ,

শ্রমণ আর সাধারণ ঔপনিবেশিকেরা বাঙলাদেশে এসে বসবাস ক’র্‌তে থাকে, আর তাদের দ্বারাই মগধের আর্য্য-ভাষা বাঙলাদেশে আনীত আর স্থাপিত হয়। তার আগে হয় তো দু’ চার জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক বা অন্য শ্রেণীর লোক, আর্য্য-ভাষী পশ্চিম-দেশ থেকে অনার্য্য বাঙলায় যাওয়া-আসা ক’র্‌ত, কিন্তু মৌর্য্যদের বিজয়ের ফলে রাজশক্তির প্রভাব-দ্বারাই আর্য্য-ভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়—তার আগে বাঙলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা কেউ আর্য্য-ভাষা ব’ল্‌ত ব’লে বোধ হয় না। দেশে নানা দ্রাবিড়- আর কোল-জাতীয় লোকের বাস ছিল, তাদের নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা রীতি-নীতি, সবই ছিল। অবশ্য, মৌর্য্য-বিজয়ের আগে থেকেই, আর্য্য-ভাষী, সমৃদ্ধ, সুসভ্য প্রতিবেশী মগধের আর্য্য-ভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্য্যদের উপর অল্প-স্বল্প এসে থাক্‌তে পারে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের কথা দূরে থাক্, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও আর্য্য-ভাষা অত’ আগে, অর্থাৎ মৌর্য্যদের আগে, গৃহীত হ’য়েছিল কিনা জানা যায় না। এখানে আপত্তি উঠ্‌তে পারে যে, তা-হ’লে বাঙলাদেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে বিজয়সিংহ ‘হেলায় লঙ্কা করিল জয়’ কি ক’রে? বিজয়-সিংহের সঙ্গীদের বংশধরেরাই তো সিংহলী ভাষা বলে, আর সিংহলী হ’চ্ছে আর্য্য-ভাষা; তা-হ’লে বিজয়সিংহ সদল-বলে বাঙলা থেকে গিয়ে’ থাক্‌লে, তারা বাঙলাদেশ থেকেই তো আর্য্যভাষা নিয়ে’ গিয়েছিল? বিজয়সিংহ বাঙলাদেশ থেকে গিয়ে’ থাক্‌লে, মৌর্য্য যুগের আগে থেকেই এ দেশে আর্য্য-ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ’য়ে যায় বটে। কিন্তু বিজয়সিংহ বাঙলার

লোক ছিলেন না; এ কথা শুনে অনেক বাঙালী চ'টে যাবেন, বা দুঃখিত হবেন। কিন্তু 'দীপবংস' আর 'মহাবংস' ব'লে পালি ভাষায় লেখা সিংহলের যে দুইখানি প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বিজয়সিংহের কথা পড়ি, সে দু'টী আলোচনা ক'রলে, বিজয়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। পালি বই-অনুসারে বিজয়সিংহ হ'চ্ছেন 'লাল' বা 'লাড়' দেশের রাজার ছেলে; এই 'লাল' বাঙলার 'রাঢ়' বা 'লাঢ়' নয়—এ হ'চ্ছে গুজরাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 'লাট' বা 'লাড়'। 'দীপবংস' আর 'মহাবংস'-র মতে বিজয়সিংহ লঙ্কায় যাবার সময় 'ভরুকচ্ছ' আর 'সুপ্পারক' বন্দর দু'টী ছুঁয়ে যাচ্ছেন; এই দুই বন্দর এখনও গুজরাট-অঞ্চলে বিদ্যমান, এদের এখনকার নাম হ'চ্ছে 'ভরোচ' আর 'সোপারা'। আর সিংহলী ভাষা অনুশীলন ক'রে জার্মান বিদ্বান্ Geiger গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে এর যোগ আছে, মাগধী ভাষার সঙ্গে নয়। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র-অঞ্চলের ভাষার যে রকম যোগ আছে, সে রকম যোগ বাঙলার সঙ্গে যে নেই,—সে সম্বন্ধে আমি একটা প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ভারতীয় আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'প্রতিধ্বনি' বা 'অনুকার' শব্দের রীতি আছে। কোনও শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের অনুরূপ বা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ ক'রতে হ'লে, আধুনিক আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সেই শব্দটাকে আংশিকভাবে দ্বিত্ব ক'রে বলা হয়, তার আদ্য ধ্বনিটার বদলে অন্য একটা ধ্বনি বসিয়ে' বলা হয়। যেমন—বাঙলায় 'ঘোড়া-টোড়া', মৈথিলীতে 'ঘোরা-তোরা', হিন্দীতে 'ঘোড়া-উড়া', গুজরাটীতে

'ঘোড়ো-বোড়ো', মারহাট্টীতে 'ঘোড়া-বিড়া', তামিলে 'কুতিরৈ-কিতিরৈ', ইত্যাদি। দেখা যায় যে বাঙলা ভাষায় (অন্ততো পশ্চিম-বঙ্গের ভাষায়) মূল ধ্বনিটীর স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্বনিটী হ'চ্ছে 'ট', মৈথিলীতে 'ত', হিন্দিতে 'উ', গুজরাটীতে 'ব', মারহাট্টীতে 'বি', আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'কি', বা 'ক' বা 'গ'; আর ওদিকে সিংহলীতে দেখা যায় যে এইরূপ স্থলে 'ব' ব্যবহার হয়, গুজরাটী-মারহাট্টীর মতন—বাঙলার মতন 'ট' বা মৈথিলীর মতন 'ত' বা হিন্দীর মতন 'উ' নয়; যেমন সিংহলী 'অশ্বয়-বশ্বয়'—বাঙলা 'অশ্ব-টশ্ব', সিংহলী 'দৎ-বৎ'—বাঙলা 'দাঁত-টাঁত'; কিন্তু গুজরাটী 'দাঁত-বাঁত', মারহাট্টী 'দাঁত-বিত'। এই বিষয়ে সিংহলীর সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের ভাষার আশ্চর্য্য মিল দেখা যাচ্ছে,—এই মিল হ'চ্ছে এদের মৌলিক যোগের ফল; এইরূপ অনুকার শব্দ-ব্যবহারে, অন্য ভাষার প্রভাবের কথা আমরা কল্পনা ক'র্‌তে পারি না। বিজয়সিংহের দল, অর্থাৎ সিংহলের প্রথম আর্য্যভাষী উপনিবেশিকেরা, লালু, অর্থাৎ লাড়, লাট বা গুজরাট থেকেই গিয়েছিল, বাঙলা থেকে নয়;—'ব' অনুকার-ধ্বনি ব্যবহার করে এমন পশ্চিম-ভারতের প্রাকৃত ভাষাই তারা মাতৃভাষা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে' গিয়েছিল। এ ছাড়া, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে চীনা পরিব্রাজক Hiuen Thsang হিউএন্-থ্‌সাঙ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আর্য্যদের সিংহল-জয়ের কথা ব'লে গিয়েছেন; তাঁর শোনা কিংবদন্তী কিন্তু পালি বইয়ের কিংবদন্তীর সঙ্গে মেলে না—তাঁর শোনা কথায় প্রথম ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দক্ষিণ-ভারতের কোনও স্থানের লোক। কাজেই, বিজয় যখন বাঙলার-ই লোক ন'ন, তখন

তাঁর কাহিনী থেকে বাঙলার সম্বন্ধে কিছু অনুমান কর্‌বার অধিকার আমাদের নেই।

বাঙলাদেশে যে অনার্য্যের বসতি ছিল, তা আমরা এ দেশের প্রত্যন্তভাগে এখনও অনার্য্য জা'তের বাস দেখে অনুমান ক'র্‌তে পারি। বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্য্য-ভাষিতার আর একটী প্রমাণ আমরা পাই বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে—পুরানো বাঙলার তাম্রশাসনে প্রাপ্ত নামের কথা বল্‌বার সময় এ বিষয়ের উল্লেখ ক'রেছি। পশ্চিম-বাঙলায় ভূমিজ, সাঁওতাল, ওরাওঁ, মালপাহাড়ীরা এখনও বিদ্যমান; উত্তর-বাঙলায় আর পূর্ব্ব-বাঙলায় ভোট-ব্রহ্ম বা মোঙ্গোল জাতীয় অনার্য্য এখনও র'য়েছে, চোখের সাম্‌নে এরা বাঙালী হ'চ্ছে,—হিন্দু হ'চ্ছে, খ্রীষ্টান হ'চ্ছে, মুসলমানও হ'চ্ছে। মৌর্য্যযুগ বা তার আগে থেকে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধ'রে এই রকমটা হ'য়ে আস্‌ছে। বিহার আর উত্তর-ভারতের আর্য্য-ভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ, প্রতিষ্ঠাপন্ন মগধদেশের প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলায় এল'। রাজার ভাষা, ধর্ম্মের ভাষা, সভ্যতার ভাষা হিসেবে এদের ভাষা অনার্য্য-ভাষী বাঙালীর মধ্যে প্রচারিত হ'তে লাগ্‌ল। অনুমান করা যেতে পারে, দেশে অনার্য্য অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল, কারণ এ দেশে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য-ভাষী জা'ত (এদের মৌলিক উৎপত্তি যাই হোক) তাদের নিজ নিজ ভাষা নিয়ে' রীতিনীতি নিয়ে' বাস ক'র্‌ত—কোল, দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল। কোথাও কোথাও বা Dravidian Longheads, Alpine Shortheads আর Mongol Shortheads বা দ্রাবিড়-ভাষী, কোল-ভাষী, মোঙ্গোল-ভাষী এই তিন জা'তের মধ্যে দু'টীতে

বা তিনটীতে মিলে'-মিশে' আর্য্য-ভাষীদের আস্‌বার আগেই মিশ্র জা'তের সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই সব মিশ্র জা'তের মধ্যে এই তিনটী ভাষার একটী-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ঠিক খবরটী জান্‌বার উপায় নেই। বাঙলাদেশে দ্রাবিড়, কোল আর মোঙ্গোল-ভাষীদের সমাবেশ কি-রকম ভাবে ছিল, তার একরকম মোটামুটী ধারণা ক'র্‌তে পারি বটে—কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটী জুড়ে ছিল, দ্রাবিড়েরা ছিল বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে, আর মোঙ্গোলরা ছিল পূর্ব্ব-বঙ্গে আর উত্তর-বঙ্গে, এইরূপই অনুমান হয়—কিন্তু এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল, ভাবের ভাষার সভ্যতার আদান-প্রদানই বা কি-রকম হ'ত, তাদের মধ্যে মিশ্রণ কি ভাবে হ'ত, দেশের প্রকৃত অবস্থা অনার্য্য-যুগে কি-রকম ছিল,—এ সব জান্‌বার কোনও পথ নেই। আর্য্য-ভাষার উপর দ্রাবিড়-প্রভাব নিয়ে আলোচনা কিছু কিছু হ'য়ে গিয়েছে। সম্প্রতি Jean Przyluski ঝাঁ প্‌শিলুস্‌কি নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত, কোল-ভাষা যে বিরাট্ Austric অষ্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত (যে ভাষা-গোষ্ঠী ভারত থেকে Indo-China ইন্দোচীন আর Indonesia ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারত হ'য়ে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের Melanesian মেলানেসীয় আর Polynesian পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত), আর্য্য-ভাষার উপর তার প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান ক'র্‌ছেন। তাঁর অনুসন্ধানের ফলে, বাঙলাদেশের আর বাঙলার বাইরের কোলদের আর তাদের জ্ঞাতিদের ভাষা থেকে সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে কি-রকমের শব্দ নেওয়া হ'য়েছিল, তার খবর আমরা পাচ্ছি; আর তার দ্বারা কোলদের সভ্যতা-সম্বন্ধে কিছু কিছু

তথ্য-লাভও হ'চ্ছে। এইরূপ টুকিটাকী খবরে মনটা খুশী হয় না—কিন্তু নাচার; আমাদের পুরো অবস্থাটি জান্‌বার পথ নেই। কারণ, দেড় হাজার বছর হ'য়ে গেল বাঙলার এই সব অনার্য্য-ভাষী লোক আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিঁদু হ'য়ে গিয়েছে; তাদের প্রাচীন চাল্‌-চলন একেবারে ভুলে' গিয়েছে, বা বহু স্থলে আর্য্যত্বের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা আচরণীয় অনাচরণীয় আধুনিক কালের নানা জাতে পরিণত হ'য়েছে। কিছু কিছু পরিমাণে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও হ'য়েছে; আবার আজকাল Neo-Hinduism বা নব্য-হিন্দুয়ানী আর ইউরোপীয়দের দ্বারা পুনর্গঠিত আর্য্য-শ্রেষ্ঠতাত্মক ইতিহাস-চর্চ্চার ফলে নোতুন ক'রে এই সব জা'ত দ্বিজ বা আর্য্য জাতির সামিল হবার চেষ্টা কর্‌ছে; আর এই ভাবে, রহস্যটা না বুঝে-ও, উত্তর-ভারতের আর্য্যদের সৃষ্ট জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা ক'র্‌ছে। চীনা পরিব্রাজক Hiuen Thsang হিউএন্‌-থ্‌সাঙ্‌ যখন সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, তখন তিনি বাঙলা দেশটাও ঘু'রে যান। তিনি এই দেশের সভ্যতা, বিদ্যা আর ভাষা-সম্বন্ধে যা ব'লে গিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় যে, তখন সারা বাঙলা-দেশটা মোটামুটী আর্য্য-ভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্য বিদ্যার আলোচনা ব্রাহ্মণ্য, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছিল। কিন্তু তখন উড়িষ্যা আর্য্য-ভাষী হয়নি—হিউএন্‌-থ্‌সাঙ্‌ স্পষ্ট ব'লে গিয়েছেন যে, উড়িষ্যা-অঞ্চলের ওড্র আর অন্য অন্য জাতি অনার্য্য-ভাষা বল্‌'ত। মৌর্য্যযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিউএন্‌-থ্‌সাঙের সময়—খ্রীঃ পূঃ

৪র্থ থেকে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক—এই কয় শ' বছরের মধ্যে বাঙালী ব'লে একটী বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়: অনার্য্য, কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল, আর হয়তো কোনও অজ্ঞাতভাষা-ভাষী Longheads লম্বা-মাথা, Alpine আল্পাইন গোল-মাথা আর Mongol মোঙ্গোলদের যে'ন এক কড়ায় ঢেলে গলিয়ে' নিয়ে', আর্য্যভাষা, আর্য্য-সভ্যতা, আর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ আর জৈন ধর্ম্মের ছাঁচে ঢেলে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ এই আদি-বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়। এই জাতের সৃষ্টিতে, পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চ বর্ণকেও কিছু কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা হ'য়েছে। বাঙলায় আর্য্য-প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতো ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাট্দের সময় থেকে, উত্তর-ভারতের (মধ্যদেশের বা আর্য্যাবর্ত্তের) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে', ভূমি দিয়ে' বৃত্তি দিয়ে' বসানো হ'ত—যাতে তাঁরা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম আর সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত ক'র্‌তে পারেন। এটী খুবই সম্ভব যে, এই সব আর্য্যা-বর্ত্তীয় ব্রাহ্মণ বাঙলায় এসে উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে, ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় কালে—যার কোনও ইতিহাস আমাদের নেই সেই যুগে—স্থানীয় বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, বা ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতের সঙ্গে, বৈবাহিক সূত্রে মিশে' গিয়েছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ্যা ব'লে একটী নোতুন বিদ্যা আমাদের ব'ল্‌ছে এই যে, দৈহিক গঠনে সাধারণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাঙলায় ব্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থ, নবশাখ, নমঃশূদ্র প্রভৃতির যতটা মিল দেখা যায়, আর্য্যাবর্ত্তের কনৌজিয়া-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে ততটা মিল নেই। এই কথাটী চিন্তার যোগ্য।

(৯)

কোনও দেশে তার নিজের ভাষাকে মেরে' ফেলে একটী বিজাতীয় বা বিদেশীয় ভাষার প্রসার সাধারণতো এই ভাবেই হ'য়ে থাকে :—প্রথমতো, ঐ দেশ অন্য জা'তের দ্বারা বিজিত হয়, আর বিদেশীয় ভাষা আসে রাজার ভাষা হ'য়ে। যদি সভ্যতায়, সংঘ-শক্তিতে আর মানসিক উৎকর্ষে বিদেশীয় জেতারা দেশীয় বিজিতদের চেয়ে উন্নত না হয়, তাহ'লে বিদেশীয় ভাষার পরাভব কিন্তু যদি বিদেশীয়রা এই সব গুণে বিজিতদের চেয়ে উন্নত, অন্ততো বিজিতদের সমকক্ষ হয়, তাহ'লে বিজিতদের মধ্যে জেতার ভাষার প্রচার সহজে হয়। যেখানেই বিদেশীয় ভাষা এসে' স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস ক'র্ছে, সেইখানেই দেখা যায় যে, সংঘ-শক্তির অভাবে আত্ম-বিশ্বাস আর নিজের জা'তের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে', বিজিতদের মধ্যে যারা জন-নেতা তারা বিদেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; দেশের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা বিদেশীয় ভাষা এরূপ একবার স্বীকৃত হ'য়ে গেলে, সেটা একটী অনুকরণীয় বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়,—সাধারণ লোকের মধ্যে বিদেশীয় ভাষাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া আর নিজের ভাষা ত্যাগ করা আভিজাত্যের বা উৎকর্ষের প্রমাণ ব'লে গণ্য হয়; তখন দ্রুত-গতিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীয় ভাষাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশে আর্য্যভাষা এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। রাজপুরুষ, ব্যবসায়ী, ধর্ম্মগুরু, সাধারণ ঔপনিবেশিক—সব দিক্ থেকেই প্রভাব আসে। আর বাঙলার অনার্য্য, সংঘ-শক্তির অভাবে, ঐক্যের অভাবে, বোধ হয় জাতীয়তা-বোধের অভাবে, আর উত্তর-ভারতে তাদের

জাতিদের ইতিমধ্যে আর্য্য-ভাষা-গ্রহণের দৃষ্টান্তে, সহজ-ভাবেই আর্য্যভাষা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা নিয়েছিল।

বাঙলাদেশ মুখ্যতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টী বিভাগে বিভক্ত :—রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন, বঙ্গ, কামরূপ। এই নামগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই হ'চ্ছে জা'তের নাম—জা'তের নাম থেকে দেশের নামকরণ খুবই সাধারণ প্রথা। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র,—আর কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, কমিল্লা প্রভৃতি নামের 'কাম' বা 'কম' শব্দ—এগুলি আর্য্যভাষার পদ নয়। এগুলি হ'চ্ছে অনার্য্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হ'য়েছে। তুলনীয়—আসাম= 'আসম' বা 'অহম' জাতি। রাঢ় যে এক দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্য জাতির নাম ছিল, তার ইঙ্গিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও পাই। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গের মত অন্য অন্য অনেক অনার্য্য জাতি বাঙলায় বাস ক'র্‌ত—তাদের নাম থেকে বাঙলার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়নি বটে, তবুও তারা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতি। এখন এই সব জাতি নিজেদের আর্য্য, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব'লে পরিচয় দিচ্ছে; এই সকল জাতির শূদ্র আখ্যা ত্যাগ ক'রে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ত্বের বা বৈশ্যত্বের দাবী হ'চ্ছে, মূলতো—উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের আর বৈশ্যের তথা-কথিত আর্য্যত্বের বিরুদ্ধে এক-রকম প্রতিবাদ মাত্র—'আমরাও তোমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের মতন আমরাও আর্য্য, দ্বিজ।' আমি এই প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত ভাবটী বুঝি, আর তার সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সকলেই 'আর্য্য' হোক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হোক, আর এই-সব উন্নত জা'তের আখ্যা পেয়েও স্বধর্ম্ম- আর স্ববৃত্তি-সম্বন্ধে

আত্ম-সম্মানযুক্ত হ'য়ে শক্তিশালী হোক,—এটা আমার দেশের জন্যে, আমার বাঙালী জা'তের হিতের জন্যে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে, ঐ ব্যাপারটী দেখ্‌লে স্বীকার ক'র্‌তেই হ'বে যে, বাঙালার আদি অনার্য্য (কোল বা দ্রাবিড়-ভাষী Dravidian Longheads, Alpine আর Mongoloid শ্রেণীর) মানবগণ থেকে উৎপন্ন এই সব জা'তের কেবলমাত্র উত্তর-ভারত থেকে আগত North Indian Longheads লম্বা-মাথা আর্য্য-ভাষীকেই পূর্ব্ব-পুরুষ কল্পনা করা চলে না—বাঙালীর মধ্যে যে ধরণের দৈহিক সমাবেশের প্রাধান্য দেখা যায় (আগে যাকে [২] শ্রেণীর ব'লে ধরা হ'য়েছে) সেটা উত্তর-ভারতের 'আর্য্য' থেকে একেবারে আলাদা। লম্বা-মাথা আর গোল-মাথা শ্রেণীর কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল-ভাষী (আর কিছু-পরিমাণে উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য আর আর্য্য-ভাষী)—এই সব নানা রকমারি মাল্‌-মশলা নিয়ে', আর্য্যাবর্ত্তের বিশুদ্ধ বা মিশ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক নেতৃত্বে, এক হিন্দু-ধর্ম্ম আর বর্ণ-সমাজের সূত্রে এদের গেঁথে নিয়ে', আধুনিক হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এদের ফেলে, এদের দ্বারা আর্য্যভাষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালী হিন্দু-সমাজের পত্তন হয়। এই সমাজকে সুদৃঢ় ক'র্‌তে ৫।৭ শ' বছর বা তার বেশী লেগেছিল; সমাজে ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ স্বীকৃত হওয়ায়, সব উপাদান পূরোপূরি মিশে' chemical combination হ'তে পারেনি, এ একটা mechanical mixture হ'য়ে র'য়েছে। এই জা'তে এখন কোন্ শ্রেণীর লোকের কি স্থান, তা-ও পূরোভাবে তাদের মনঃপূত ক'রে নির্দ্ধারিত হয়নি। সুদূর স্মরণাতীত যুগের পার্থক্য এই পূর্ণ

মিশ্রণের অন্তরায় হ'য়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে কিনা কে জানে! এটাও অনুমান হয় যে, বাঙালী আর্য্য-ভাষী হ'লে পরও, বাঙলাদেশে বহু স্থলে অনেক জন-সমষ্টি ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজের জাতিভেদের শৃঙ্খল বা বিধি-নিয়ম মান্‌তে চায়নি; তারা বৌদ্ধ হ'য়ে ব্রাহ্মণকে মান্‌ত না। পূর্ব্ব-বঙ্গে হয়তো এইরূপ বৌদ্ধ সমাজই বেশী ছিল। অনুমান হয়, মুসলমান-বিজয়ের পরে রাঢ়ী আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশী ক'রে গিয়ে' বসবাস কর্‌বার পরে ও-অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,—'বঙ্গজ' কায়স্থ আছে, বৈদ্য আছে, কিন্তু 'বঙ্গজ' ব্রাহ্মণ নেই। বৌদ্ধ বাঙালীদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ে ভালো বা শুদ্ধ হ'লেও, হিন্দু-সমাজে দেরীতে প্রবেশ করার জন্য সমাজে নিম্ন বা অনাচরণীয় স্তরে-ই গৃহীত হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ আবার অনেকের কখনও যায়নি; তুর্কীরা বাঙলা জয় কর্‌বার কিছু পরেই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বৌদ্ধ অনেকে, নবাগত জেতাদের ধর্ম্মকে (অন্ততো নামে-মাত্র) স্বীকার ক'রে, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে।

(১০)

এম্‌নি ক'রেই আর্য্যভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালী জা'তের সৃষ্টি হ'ল। খ্রীষ্টাব্দ ৬০০ আন্দাজ এই জা'ত দাঁড়িয়ে' গেল—ভারতের মধ্য- আর আধুনিক-যুগের বিশিষ্ট জাতিদের মধ্যে অন্যতম হ'য়ে। আনুমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় পালবংশের অভ্যুদয় হ'ল। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর এরা রাজত্ব করেন। শেষটা বাঙলাদেশ এঁদের

অধিকারে আর ছিল না, এঁরা খালি বিহারে রাজত্ব ক'র্তেন। এঁদের সময়ে গৌড়-বঙ্গ বা বাঙলা-দেশ, মগধ-দেশের সঙ্গে মিলে' ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বড়ো জা'ত ব'লে আসন পায়। বাঙালীর সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ মুসলমান তুর্কীর আস্‌বার পূর্ব্বে যেটুকু হ'য়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদেরই আমলে। সেটুকু নেহাত্ কম নয়—কি বিদ্যায়,—কাব্যে, ব্যাকরণে, সাহিত্যে, দর্শনে, স্মৃতিতে; কি শিল্পে, রূপকর্ম্মে, ভাস্কর্য্যে; আর কি শৌর্য্যে, সব বিষয়ে হিন্দু-যুগের বাঙলার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই পাল রাজাদের সময়ে। গৌড়-মাগধ ভাস্কর্য্য-রীতি ভারতে শিল্পের মধ্যে এক অপরূপ সৃষ্টি—তা এই পাল রাজাদের সময়েই হয়। ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ পণ্ডিতে মিলে, এক বিরাট্ সংস্কৃত সাহিত্য বাঙলায় গ'ড়ে তোলেন; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বাঙলার বাহিরে ভগবান্ বুদ্ধের বাণী আর তখনকার দিনের নবীন বাঙলার চিন্তা প্রচার ক'র্তে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে বাঙলা ভাষায় বোধ হয় প্রথম কবিতা লেখা হয় পণ্ডিতের দ্বারা; আর বাঙলা ভাষার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। এগারোর শতকের শেষের দিকে পাল রাজারা রাঢ়ের সেনবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙলা থেকে বিতাড়িত হন। সেন-বংশীয় রাজারা—হেমন্তসেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন—বারোর শতকে রাজত্ব করেন; তাঁদের সময়ে বাঙলায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিরাট্ এক অভ্যুত্থান হয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম তার মধুর ভাব নিয়ে' নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাজাদের সময়ে হিন্দু-বাঙালীর সমাজের প্রতিমা এক-রকম তার পূর্ণ-রূপ পেলে; তার কাঠামো গড়া হ'য়েছিল পাল-বংশের পূর্ব্বে, এক-মেটে' আর দো-মেটে' হয় পাল-

বংশের অধীনে; আর তার রঙ-চঙ-করা, চোখ চান্‌কানো, সাজানো হ'ল সেনবংশের সময়ে। তারপর তুর্কী-আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় ব'য়ে গেল, বাঙালী জা'ত যেন দু' শ' বছর মূর্চ্ছাগ্রস্ত হ'য়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এই জাতি আবার চোখ মেল্‌লে; তার চিন্তাশক্তি আর সাহিত্য আবার প্রাণ পেলে। আর বাঙালী জা'তকে তার পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এসে, যাঁর সম্বন্ধে কবির উক্তি—'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া'—সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি।

এতদিন ধ'রে বাঙালী ঘর-মুখো হয়েই কাটাতে পেরেছে, দেহে আর মনে তাকে বড়-একটা বাঙলার বাইরে যেতে হয়নি; বড়ো জোর পুরী, মিথিলা, কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী পর্য্যন্ত সে ঘুরে' এসেছে। কিন্তু এখন সে কাল আর নেই, বিশ্বের সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে বাঙালীকে এখন যুক্ত হ'তে হ'চ্ছে। নবীন যুগের নানা নোতুন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এখন বাঙালীকে বিচলিত ক'রে তুল্‌ছে—দেহে-মনে তাকে আর ঘ'রো বা প্রাদেশিক হ'য়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। তাকে ও-দিকে যেমন তার দেশের প্রাচীন কথা জান্‌তে হ'বে, দেশের প্রাচীন গৌরব কোথায় সেইটীর উপলব্ধি ক'র্‌তে হবে; তেমনি তাকে বিশ্বের মধ্যে একজন হ'য়ে তার কর্ত্তব্য আর তার অধিকার গ্রহণ ক'র্‌তে হবে,—তার জা'তের দ্বারা যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব, তাকে তা-ই অর্জ্জন ক'র্‌তে হবে। এই নবীন যুগে ঘরে-বাইরে নানা সংঘাত, সংশয়, আশা, আশঙ্কা, আনন্দ, বিষাদ তাকে অভিভূত ক'র্‌ছে। কিন্তু তার ভাগ্যক্রমে, তার জা'তের নিহিত কোনো অদৃষ্ট শক্তির ফলে, সে এই যুগে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে—রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ।

মাত্র হাজার দুই বছর কি তার চেয়েও কম নিয়ে' বাঙালীর অতীত ইতিহাস—খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে বাঙ্গালী জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা মাগধী-প্রাকৃতকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষার বনিয়াদ-স্থাপন। তার আগে প্রায় হাজার বছর ধ'রে, ধীরে ধীরে এই সৃষ্টিকার্য্য চ'লছিল। তখন সেই সৃষ্টির যুগে প্রস্তূয়মান বাঙালী জা'তের গৌরবের কি ছিল জানি না—তবে তখন আদি-বাঙালী সংস্কৃত ভাষা আর আর্য্য সভ্যতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, আত্মসাৎ ক'রে নিচ্ছে. সংস্কৃত ভাষায় বাঙলার বিদ্বজ্জন সাহিত্য লিখ্তে আরম্ভ ক'রেছে, এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে 'গৌড়ী রীতি' ব'লে একটা রচনা-শৈলীও খাড়া হ'য়ে গিয়েছে। তার পূর্ব্বে বাঙালী ছিল অনার্য্য-ভাষী—বাঙালী বা গৌড়ীয় বা গৌড়-বঙ্গ ব'লে তখন এক ভাষা এক রাজ্য এক ধর্ম্মের পাশে বদ্ধ কোনও জা'ত ছিল না—কিন্তু রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষ দ্রাবিড় আর কোল-ভাষীগণদের স্বকীয় একটা সভ্যতাও যে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগ্-আর্য্য যুগে তারা ভালো ভালো শিল্প জান্ত, মিহি কাপাসের সূতোর কাপড় বুন্ত, হাতী পুষ্‌ত, জাহাজে ক'রে ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা' ক'র্‌তে যে'ত, উপনিবেশ স্থাপন ক'র্‌তেও যেত' ;—আর যে ধর্ম্মভাব পরবর্ত্তী যুগে সহজিয়া, বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব আর মুসলমানী সূফী মতকে অবলম্বন ক'রে এমন সুন্দর দর্শন আর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধি-দ্বারা নব্য-ন্যায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হ'য়েছিল, তারও মূল যে এই আদি-অনার্য্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না।

বিদেশ থেকে আগত আর অধুনা বঙ্গীভূত কোনও কোনও জাতি বা সমাজকে বাদ দিলে, আদি-বাঙালীর অর্থাৎ আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বাঙালী জা'তের পিতামহ বা মাতামহ বা উভয় কুলের পূর্ব্ব-পুরুষদের এইরূপ পরিচয় আঁক্‌বার চেষ্টা দেখে, যাঁরা সত্যযুগের অস্তিত্বে আর সংস্কৃতে-কথা-বলা দিব্য-শক্তিশালী ঋষিদের শাসিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁরা খুশী হবেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক আর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা পূর্ব্ব-কথার নষ্ট-কোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার ক'র্‌লে আমাদের ইতিহাস আর আমাদের জা'তের পূর্ব্ব-পরিচয়টা এইরকমই দাঁড়ায় ব'লে আমার বিশ্বাস। খালী আমাদের বাঙালীদের যে দাঁড়ায় তা নয়, ভারতের আরও অনেক জাতি-সম্বন্ধে এই ধরণের কথাই ব'ল্‌তে হয়। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ—আমাদের সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা উচিত ;—আমাদের সহজ জাতীয়তার গৌরববুদ্ধি, আমাদের অতীত-সম্বন্ধে যে কল্পনোজ্জ্বল অথচ অস্পষ্ট ধারণা আছে, তার উপরে সত্য-দিদৃক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই। আমাদের অতীত কিছু অগৌরবের নয় ;—মোটে দু' হাজার, দেড় হাজার বছরের হ'ল-ই বা ? কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও গৌরবময় ক'রে তুল্‌তে হবে,—এই বোধ যেন আমাদের থাকে, আর তা যেন আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আর ব্যক্তিগত জীবনে শক্তি দেয়।

[এই প্রবন্ধ ছাপার সময়ে ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, অধুনা ভারত-সরকারের প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা-বিষয়ক গবেষণাবিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহের সঙ্গে বাঙলার নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ হয়, তাতে দু' একটী বিষয়ে নূতন তথ্য তাঁর নিকট পাই, আর তাঁর সমালোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হই। বন্ধুবরের কাছে সেইজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।]

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৫ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত, ৩১ ভাদ্র, ১৩৩৫]

বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষা-ভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য।

আমাদের আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সৃষ্টিতে নিম্ন-বর্ণিত কয় প্রকারের উপাদান আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, **তদ্ভব বা প্রাকৃতজ** শব্দ : মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদের ভাষা ; ইহাদিগকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আর্য্যভাষার স্বকীয় বলিতে কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্য্যযুগে শব্দগুলি যেরূপে প্রচলিত ছিল, মুখে মুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আর এক বংশপীঠিকায় ভাষাস্রোত যখন বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এবং নানা অনার্য্য জাতির মধ্যে এই আর্য্য-ভাষা যখন প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলি আর অবিকৃত থাকিতেছিল না ; পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সেইগুলিকেই আধুনিক আর্য্যভাষার নিজস্ব 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্য্যভাষার বিভক্তি-প্রত্যয়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল।

তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দের পরে ধরিতে হয়—দ্বিতীয়—**তৎসম** শব্দ, তৎ-সম অর্থাৎ সংস্কৃত-সম শব্দ। কথ্য

বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আর্য্যভাষার বহতা নদী লোকমুখে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্ডিতজন দেখিলেন যে প্রাচীন আর্য্য বা বৈদিক বা ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ আর বলে না। ভাষার গতি-নিরোধ বা সংযমন অসম্ভব। তখন তাঁহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চ্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা 'সংস্কৃত' নামে খ্যাত হইল। মৌখিক ভাষার গতি যে দিকেই যাউক না কেন, তাঁহারা সংস্কৃতের-ই চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন; এবং এইরূপে পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষারও গতি চলিল। মৌখিক ভাষা বহতা নদী,—সংস্কৃত তাহার পাশে যেন কাটা খাল, ব্যাকরণের দুই উঁচু পা'ড় অতিক্রম করিয়া চলে না। ভাষায় যে সমস্ত আদি-যুগের আর্য্য-শব্দ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূলরূপ সংস্কৃতেই রক্ষিত হইয়া আছে। আবশ্যক হইলে কথিত-ভাষার পার্শ্বেই বিদ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দাবলী, ইচ্ছামত এই কথিত-ভাষায় গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই সব শব্দকে আধুনিক ভাষার 'তৎসম' শব্দ বলা হয়।

আবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোকমুখে তাহারও বিকার ঘটিয়াছে। এই

বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নূতন রূপ দাঁড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ তদ্রূপ বিকৃত তৎসম শব্দের একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন—**ভগ্ন-তৎসম** বা **অর্দ্ধ-তৎসম** (semi-tatsama)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতিপথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে ভাবে তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, দেখা যাইতেছে যে অর্দ্ধ-তৎসমের উৎপত্তি সে ভাবে হয় নাই। আবার এমনটীও হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিকবার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণরীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া ঐ একটী শব্দই একাধিক অর্দ্ধ-তৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, তৎসম, এবং নানা যুগে উদ্ভূত অর্দ্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ এক ‘কৃষ্ণ’ শব্দ-দ্বারাই দেখানো যাইতে পারে। আদি আর্য্যযুগের ভাষায়, ধরা যাউক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০-এ, ‘কৃষ্ণ’ শব্দ অবিকৃত অবস্থায় ‘কৃ-ষ্-ণ’ বা ‘ক্র্-ষ্-ণ’ রূপে ভারতবর্ষে আর্য্যভাষিগণ-কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্তু এই অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল:— ‘*কর্-ষ্-ণ’ ‘*ক-ষ্-ণ’ প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া ‘*ক-হ্-ণ’, এবং অবশেষে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে ‘ক ণ্ হ’ রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তখন শব্দটীকে আর ‘আদিযুগের আর্য্য’ শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন ‘মধ্যযুগের আর্য্য’ বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষাগত তাবৎ শব্দ যেখানেই একটু পরিবর্ত্তনসহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এই ‘কৃষ্ণ’>‘ক ণ্ হ’ শব্দ, প্রাকৃত যুগের

অবসানে আধুনিক আর্য্যভাষার যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে, 'কান্‌হ' ও পরে 'কান' আকার ধারণ করিয়াছে। তিন হাজার বছরে এইরূপে 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিণতি ; এবং 'কান্‌হ' শব্দে আদরে '-উ' প্রত্যয়-যোগে 'কান্‌হ'>'কানু' রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব্দ। ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্ণ' শব্দ বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত 'কণ্‌হ' রূপের পার্শ্বে, প্রাকৃত যুগে কথ্য ভাষায় নূতন করিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দ গৃহীত হইল ; কিন্তু প্রাকৃত-ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ '*কর্ষ্‌ণ', '*ক্রষ্‌ণ', '*ক্রষণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাকৃতে 'কসণ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাকৃতের পক্ষে অতএব 'কণ্‌হ' হইল তদ্ভব রূপ, 'কসণ' প্রাকৃতে আগত অর্দ্ধ-তৎসম রূপ। পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা 'কান্‌হ' শব্দ পাই—তদ্ভব বা প্রাকৃতজ অর্থাৎ প্রাকৃতের নিকট হইতে লব্ধ রূপ হিসাবে, এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ হিসাবে পাই 'কসণ' ('কসণ ঘন গাজই' = কৃষ্ণ ঘন গর্জ্জে, প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদ ১৬)। তৎসম 'কৃষ্ণ' শব্দ তো ছিল-ই। এই 'কসণ' শব্দ পরে বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দ আবার নূতন উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্দ্ধ-তৎসম রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'*ক্রেষ্‌ণ', '*ক্রেষ্‌ট্য' প্রভৃতি মধ্য-যুগের বাঙ্গালাদেশে প্রযুক্ত সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণরীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে, শেষে 'কেষ্ট' (='কেশ্‌টো') রূপ আসিয়া গিয়াছে। ও দিকে হিন্দীতে তদ্ভব রূপ 'কান্‌হ', 'কন্‌হৈয়া' (='কানাইয়া') বিদ্যমান আছে ; তাহার পার্শ্বে

আবার নবীন হিন্দী অর্দ্ধ-তৎসম রূপের সৃষ্টি হইল 'কিসন, কিসেন'; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নাম হিসাবে, মথুরা-বৃন্দাবন-অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া গেল—'কিষেণ' 'কিষণ' রূপে। অতএব ভারতের আদি আর্য্য ভাষার 'কৃষ্ণ' শব্দ, তাহার দৌহিত্রী-স্থানীয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই মূর্ত্তিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে :—

১। 'কান'—খাঁটী বাঙ্গালা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ। আদরার্থক '-উ' ও '-আই' প্রত্যয় যোগে প্রসারে 'কানু' ও 'কানাই'।

২। 'কসণ'—প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাকৃত হইতে লব্ধ অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ; অধুনা লুপ্ত।

৩। 'কেষ্ট'—মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ কচিৎ 'কিষ্টো' রূপে উচ্চারিত হয়।)

৪। 'কিষণ্', 'কিষেণ্'—হিন্দী হইতে উদ্ধারিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ 'কিসন্' বা 'কিসেন্'-এর বাঙ্গালা বিকার।

৫। 'কৃষ্ণ'—তৎসম শব্দ—উচ্চারণে যাহাই হউক, বানানে এটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। (বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ 'ক্রিশ্‌নে' বা 'ক্রিশ্‌টো'; উৎকলে 'ক্রুশ্‌ড়'; হিন্দুস্থানে 'ক্রিস্‌ন্' বা 'ক্রিশ্‌ড়ঁ'।)

(১) তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, (২) তৎসম, এবং **(২ ক) অর্দ্ধ-তৎসম**—এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া ভারতবর্ষের আধুনিক আর্য্যভাষাগত আর্য্য উপাদান; দেখা যাইতেছে, এই উপাদান হয় রিকৃথ-রূপে আদি আর্য্যযুগের

মৌখিক ভাষা হইতে প্রাপ্ত (‘তদ্ভব’ বা ‘প্রাকৃতজ’ শব্দাবলী), নয় প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে ঋণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত (‘তৎসম’ ও ‘অর্দ্ধ-তৎসম’ শব্দাবলী)। ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা, আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি। অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করাও তাদৃশ কষ্ট-সাধ্য নহে; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হইয়াই আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান। তদ্ভব শব্দ লইয়া অনেক স্থলে গোল নাই, ‘কর্ণ > কণ্ণ > কান’, ‘চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ’, ‘কার্য্য > কয্য > কজ্জ > কাজ’, ‘সমর্পয়তি > সমপ্পেদি > সমঁপ্পেই > সঁপে’, ‘আবিশতি > আবিসদি > আইসই > আইসে > আসে’—প্রভৃতি লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হয় না; আবার বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য একটু অনুসন্ধান করিয়া তবে তদ্ভব শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, ‘এও < আইও < আয়্য < আইঅ < আইহ < * আইহঅ < *অইহব < অবিহবা < অবিধবা’, ‘সকড়ি, সঁকড়ি < সক্কডিআ < সঙ্কটিকা < সঙ্কট- < সং + কৃত’, ‘√পর < পহ্র, পই < পহির, পরিহ < পরি + √ধা’, ‘আয়ান < আইহণ < *অহিঅন < *অহিঅণ্ন < অহিবণ্ণ < অভিমন্যু’, ‘দেরখো, দেউরখা < *দিঅউরখা < দিঅরুখা < দীবরুক্খ- < দীপবৃক্ষ-’, ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধু ভাষায়, তদ্ভব (বা প্রাকৃতজ) ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ শত-করা ৫১টার উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ (ফারসী, পোর্ত্তুগীস, ইংরেজী) শত-করা ৪টার কিছু

বেশী। কলিকাতার হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শত-করা ১৭; বিদেশী শব্দ শত-করা ৩, এবং বাকী শত-করা ৮০টা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, অর্দ্ধ-তৎসম এবং অজ্ঞাত-মূল শব্দ লইয়া।

বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়া বেশী ঝঞ্চাট নাই, সহজেই বা অল্প আয়াসে তাহাদের মূল ফারসী বা ইংরেজী বা পোর্ত্তুগীস শব্দটীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র বাঁহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, তৎসম ও অর্দ্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে; সেগুলির মূল নিদ্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এইরূপ শব্দ কিছু কিছু প্রাকৃতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন দেশী। তাঁহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় প্রাপ্ত ঐ জাতীয় শব্দ-সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রথম, অনুকার শব্দগুলিকে দেশী পর্য্যায়ে ধরা হয়:—'চট্, সাঁ, টক্‌টক্, থরথর, ছট্‌ফট্, হিজিবিজি' ইত্যাদি। কিন্তু অনুকার শব্দ ছাড়া, অন্য পদার্থ- বা ভাব- বা ক্রিয়া-বাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির পরে বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি রিক্থ-হিসাবেই প্রাকৃতের নিকট হইতেই বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,—এবং সংস্কৃতের বা আর্য্যভাষার ধাতু-প্রত্যয়-দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন—'√এড়, √নড়, টপক, পাড়া ও কাড়া (=মহিষ), ঘোমটা,

ঘেচি(-কড়ি), গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাঁটা, ঝাপ্পু, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা, ✓চাট, চোপ, পেট, কামড়, খোঁড়া, বঁইচি, ডাগর, চটী, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাসা, ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গান, ডোকলা, আড্ডা, গোড়া' প্রভৃতি। এইরূপ কতকগুলি শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা-ও ভালো করিয়া করা যায় না। যেমন—'লাড্ডু, খাড্ডু'=সংস্কৃত 'লড্ডুক, খড্ডুক'; 'তেঁতুল,' প্রাচীন বাঙ্গালা 'তেন্তলী'=সংস্কৃতে 'তিন্তিড়ী'; 'হাড়ী'='হড্ডিক' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধুভাষা পারত-পক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু চলতি ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মেলে। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিরূপ পাইলেও, ইহাদের পূর্ণ সমাধান-বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই না'।

ইহাদের অনেকগুলি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আগত; সেজন্য সেগুলিকেও প্রাকৃতজ বলা যায়। কিন্তু মূলতঃ ইহারা আর্য্যভাষার শব্দ নহে; এই জন্য, কেবল প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত তদ্ভব আর্য্য-শব্দাবলীকে 'প্রাকৃতজ' বলিয়া, ইহাদিগকে 'দেশী' পর্য্যায়ে আলাহিদা ফেলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে। ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষাগত তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম, দেশী এবং বিদেশী সর্ব্বপ্রকার শব্দ-সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, বিদেশী এবং প্রাকৃতজ ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ-সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত হই না; familiarity breeds contempt :

ইহাদের যেমন-তেমন বানান হইলেই হইল (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে—অন্যথা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতারূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে!); ইহাদের যথাযথ প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না, বা দিই না,—এ বিষয়ে আমরা আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু এক অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাকৃতজ, অর্দ্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দ—অন্য অঞ্চলের সেই সেই পর্য্যায়ের শব্দাবলী হইতে রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নূতন আগত, ইহাদের অপপ্রয়োগ বা অর্থ-পার্থক্য ততটা ঘটে নাই)। যাঁহারা এক অঞ্চলে জন্মিয়া সেখানকার ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে, শিক্ষা বা অভিনিবেশের অভাবে, যথার্থ-রূপে সমর্থ হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক বা অনুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা-অঞ্চলের ভদ্র-সমাজের কথ্য ভাষা আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে; এমন কি, সাধু-ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। এই ভাষা মূলতঃ অঞ্চল-বিশেষের মৌখিক ভাষা; ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, নিজ মাতৃভাষাগত রিক্থ-হিসাবে সমগ্র বঙ্গ-দেশের সমস্ত শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, ইহার তদ্ভব, অর্দ্ধ-তৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী হইতে পারেন নাই।

সেইজন্য অবিসংবাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত রাজমার্গ-স্বরূপ সাধু-ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে যে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহা তাঁহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিকপত্রের বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার ফলে, ঐ ভাষার তদ্ভব, অর্দ্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ-রীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গদ্যের সাধু-ভাষাই আদর্শ থাকায় এতাবৎ খাঁটী বাঙ্গালাকে সাধু-ভাষার আওতায়, পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, সাধু-ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য হইয়া আছে—তাহার সন্ধি-বিচ্ছেদ, ষত্ব-ণত্ব-বিধান, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতিই ছিল ভাষাজ্ঞানের এক মাত্র পথ—বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। কারণ, খাঁটী বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু-ভাষায় আইসে, সেইটুকুর পক্ষে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষাজ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লওয়া হয়।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার জন্য ভাষার সকল রকমের উপাদানে চর্চ্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্তাময় উপাদান হইতেছে তদ্ভব ও দেশী উপাদান। একটা বড় বিষয়ে তদ্ভব (বা সঙ্কুচিত অর্থে 'প্রাকৃতজ') উপাদানের (শব্দ ও প্রত্যয়াদির) আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে—সেটী সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্তিত্ব। দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই। কচিৎ দুই-চারিটী অনুরূপ প্রাকৃত শব্দ মেলে—যেমন, বাঙ্গালা 'চাঙ্গা'—প্রাকৃত 'চঙ্গ'=ভালো; বাঙ্গালা 'পেট'—প্রাকৃত 'পোট্ট'; মারাহাট্টী 'তুপ'—প্রাকৃত 'তুপ্প'=ঘী; বাঙ্গালা 'ছট্‌ফট্‌'=প্রাকৃত 'চডপড'; বাঙ্গালা 'চাটা'=প্রাকৃত 'চট্টি', ইত্যাদি। সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ সাহায্য হইল না; কারণ, অনেক স্থলে শব্দটীর বা ধাতুটীর বাহ্য রূপ দর্শনেই সেটী যে আর্য্য ভাষা বা খাস সংস্কৃতের শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেগুলি বর্ণ-চোরা শব্দ বা ধাতু, তাহাদের উৎপত্তি অন্যত্র, সংস্কৃতের সভায় কোনও রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টায় আছে; যেমন 'তাম্বূল, লড্ডুক, খড্ডুক, হড্ডিক, তিন্তিড়ী' প্রভৃতি শব্দ; যেমন 'খিট্ট, খট্ট, লোট্ট, গুণ্ড' প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে এখন দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ বিস্তর 'দেশী' শব্দ সংস্কৃতেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং '-ক' বা তদ্রূপ অন্য কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, তাহারা আর্য্য-পর্য্যায়ের শব্দ নহে। এইরূপ অ-ব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত-মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে দেখা যায়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আর্য্যভাষার একটা বিশিষ্ট উপাদান, মূলে

যাহা আর্য্য নহে, তাহা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই পাওয়া যায়। এই সকল দেশী শব্দের উৎপত্তি কি? প্রাচীন বৈয়াকরণদের প্রদত্ত 'দেশী' নামকরণ হইতে ইহাদের মূল-সম্বন্ধে প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় না। 'দেশী' অর্থে প্রদেশ-নিবদ্ধ যাহা কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাষায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের সর্ব্বত্র গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। 'প্রাদেশিক' শব্দ—ব্যস্, এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। অনেক স্থলে তাঁহারা দেশী পর্য্যায়ে প্রাকৃতের বিস্তর তদ্ভব শব্দকেও ফেলিয়াছেন; যেমন 'হেট্‌ঠা' (অধস্তাৎ> * অধিস্তাৎ> * অধিষ্ঠাৎ> * অহেট্‌ঠা>হেট্‌ঠা, পরে * হেণ্টা, * হেণ্ট=বাঙ্গালা হেঁট), 'অইরজুবই' (নববধূ অর্থে,= 'অচিরযুবতী'), 'সুবণ্ণবিন্দু', 'অজ-বড্‌ঢণ', 'অম্বির' (=আম), 'অগ্‌গ-ক্‌খন্ধ', ইত্যাদি।

দেশী শব্দগুলির ইতিহাস-অনুশীলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট হইতে কিছু-মাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাকৃতের বহু দ্রাবিড়-দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক ও শক, এবং দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক ও রোমান জাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হয়তো দুই একজন ভারতীয় পণ্ডিত তাহাদের ভাষা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিয়া থাকিবেন; উত্তর-ভারতেও বহু স্থলে অনার্য্য-ভাষী জাতি আর্য্য-ভাষীদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও-না-কোনও পণ্ডিতের হইয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল অ-সংস্কৃত ভাষার বর্ণনাত্মক কোনও লেখা (দ্রাবিড়-ভাষার দুই একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কেহ লিখিয়া যান নাই, ভারতে সুপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অন্যান্য অনার্য্য-ভাষার আলোচনার পক্ষে তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের পক্ষে কার্য্যকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ দ্রাবিড়- ও কোল-জাতীয় ভাষার এবং গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আর্য্যভাষা মুক্ত ছিল না। প্রাচীন যুগের কথ্যভাষা নানা প্রাকৃতে, এই সকল অনার্য্য বা বিদেশী ভাষা হইতে অনেক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও এই সকল শব্দ স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আধুনিক যুগের তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাঁহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সম্ভাব্য অনার্য্য-শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমটায় সুসভ্য দ্রাবিড়-ভাষা—তামিল, তেলুগু, কানাড়ীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয় বলিয়া, আর্য্যভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদানের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়। Caldwell কল্ড্‌ওয়েল্, Kittel কিটেল্, Gundert গুণ্ডার্ট্‌-প্রমুখ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, সংস্কৃত ও অন্য আর্য্যভাষাগত অনেকগুলি শব্দের মূল যে দ্রাবিড়-ভাষায়, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি। কিছু কিছু দেশী শব্দও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সম্প্রতি আর্য্যভাষার উপর কোল-জাতীয় ভাষার প্রভাব লইয়া দুই জন ফরাসী ভারতবিদ্যা-বিৎ আলোচনা আরম্ভ

করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন পারিসের প্রাচ্যভাষা-বিদ্যালয়ের আনামী ভাষার অধ্যাপক, পালি, সংস্কৃত, কম্বুজীয়-প্রমুখ ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত Jean Przyluski ঝাঁ পৃশিলুস্কি; অন্য জন হইতেছেন বিখ্যাত সংস্কৃত ও চীনার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত Sylvain Lévi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি। পৃশিলুস্কি দেখাইয়াছেন যে 'কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, (কুড়ি), তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড় (লগী)' প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক আর্য্যভাষাগত) শব্দ, মূলে প্রাচীন কালে কোলদের অনুরূপ অনার্য্য-ভাষা বলিত এমন অনার্য্য-জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে—যে জাতির বংশধরেরা এখন আর অনার্য্য-ভাষা বলে না, তাহারা আর্য্যভাষী ও হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যজাতি বাহির হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিল। এ দেশে দুইটী বিরাট্ জাতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল—দ্রাবিড়, এবং কোল বা অষ্ট্রিক। ইহাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম্ম, সভ্যতা ও রীতিনীতি ছিল। নবাগত আর্য্যেরা সংখ্যায় ছিল কম। অনার্য্যেরা সংখ্যায় বেশী ছিল, এবং এই দেশের উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাহির হইতে আগত আর্য্যেরা পূর্ব্ব-ঈরানে ও এই দেশে আসিয়া একেবারে নূতন অবস্থার মধ্যে পড়ে—নূতন দেশে নূতন প্রকারের জীব ও উদ্ভিদ্-জগৎ, নানা নূতন ধরণের মানুষ ও তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব রীতিনীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল,—নবাগত বিজেতা আর্য্য ও বিজিত অনার্য্য দ্রাবিড় এবং কোল, এই ত্রিবিধ জাতির, তাহাদের ধর্ম্ম-সমাজনীতি, আচার-অনুষ্ঠান,

প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভ্যতা—সকল বিষয়েই তাহাদের জগতের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আর্য্যধর্ম্ম ও সমাজ, যাহার নিদর্শন আমরা বেদে পাই, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম ও সমাজ এবং চিন্তায় পরিণত হইল। আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে আপোস করিয়া লইয়া অনার্য্যদের দেবতারাও পূজা পাইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতাদের মধ্যে তাঁহাদের একটী বড়ো স্থান হইল। আর্য্যদের ভাষাও উত্তর-ভারতে অনার্য্যদের মধ্যে গৃহীত হইল; কিন্তু অনার্য্য-ভাষীদের মধ্যে প্রসৃত হওয়ার ফলে, তাহার আভ্যন্তরীণ রূপ, যাহা বাক্যরীতিকে অবলম্বন করিয়া এবং নানা খুঁটিনাটী বস্তুতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বদ্‌লাইয়া গেল। আর্য্যভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামো অন্য ধরনের হইয়া গেল; অনার্য্য-ভাষার মরা গাঙের খাত্ দিয়া আর্য্যভাষার ধাতু- ও শব্দ-রূপ জল বহিয়া চলিল। এই অবস্থায়, আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়াছে এমন আর্য্যীকৃত অনার্য্যদের মধ্যে অনার্য্য-ভাষার শব্দ যে দুই-দশটা রহিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এই সব শব্দ, এতদ্দেশের বৈশিষ্ট্য নানা উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর নাম লইয়া এবং এতদ্দেশের অনার্য্য লোকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া; এবং সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থ-বাচক নামও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত শব্দ-দ্বারা ভারতীয় হিন্দু-জগতের সৃষ্টিতে অনার্য্য কর্ত্তৃক আহৃত উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

Kittel কিটেল্‌ সঙ্কলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃত-গত, অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত অথবা সম্ভাব্য, সার্দ্ধ-ত্রিশত দ্রাবিড়-শব্দের আলোচনা আছে। ইহা হইতে আর্য্য- বা হিন্দু-সভ্যতায় দ্রাবিড়-জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল-জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা প্‌শিলুস্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া আমার সতীর্থ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়-কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

এই সকল প্রাকৃত-, আধুনিক আর্য্য-ভাষা- তথা সংস্কৃত-গত দেশী ও অজ্ঞাত-মূল শব্দের আলোচনার ফলে, ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন-সম্বন্ধে আমাদের বহুযত্ন-পোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্‌টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, অনার্য্য-দত্ত উপাদান, হিন্দু-সভ্যতার গঠনে অনার্য্যের সাহায্য, আর্য্যের আহৃত উপাদান এবং আর্য্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ গভীর, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষভাবে মৌলিক। এই বিষয়ের আলোচনা এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আমাদের ভারতীয় সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তাম্বুলের একটা বড় স্থান আছে। পান খাওয়া, পান দিয়া সংবর্দ্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া—এই সমস্ত বিশেষ-রূপে ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আর্য্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক, ভারত ও ভারত-সম্পৃক্ত এশিয়া-খণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ (Indo-China) এবং দ্বীপময় ভারত (Indonesia)

ভিন্ন অন্যত্র পান খাওয়ার রীতি নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের-ই বস্তু—ভারত, ভারত-চীন (ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা), মালয়-দেশ এবং দ্বীপময় ভারত। নবাগত আর্য্যদের কাছে এই রীতি নিশ্চয়ই নূতন ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কালে এই দেশের পুরাতন বা সনাতন রীতি-হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না, আর্য্যদেরও সামাজিক ও অন্য অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পান-বাচক শব্দও আর্য্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনার্য্যভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্র-বাচক একটী সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে আর্য্য সংস্কৃতাদি ভাষায় অনার্য্য কোল-জাতীয় 'তাম্বূল' শব্দের প্রবেশ; এইরূপে সাধারণ পত্র-বাচক 'পর্ণ> পন্ন>পান' শব্দের তাম্বূল-পর্ণ অর্থে অর্থ-সঙ্কোচ ঘটিল। কোনও সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ ভাষায় প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কৃতের ধাতু-প্রত্যয়ের সাহায্যে যদি নিশ্চিত-রূপে যুক্তির অনুকূলভাবে বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা করিতে না পারা যায়, এবং সেইরূপ শব্দ ভারতের বাহিরের অন্য ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষায় যদি না মেলে, তাহা হইলে ঐ শব্দের আর্য্যত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ ঘটে। তাহার পর, শব্দটী যদি এমন বিষয় লইয়া হয়, যাহা ভারতের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ, এবং অনার্য্য-ভাষায় তাহার অনুরূপ শব্দ যদি থাকে, ও অনার্য্য-ভাষার শব্দ-সৃষ্টির নিয়ম-অনুসারে সেই ভাষার ধাতু- ও প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদের মত বক্ষ্যমাণ পদের বিশ্লেষ যদি হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দটী অনার্য্য-ভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি আইসে। 'তাম্বূল' শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ।

সংস্কৃতে ইহা অ-সংস্কৃত পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্য-ভাষায় এই শব্দ মিলে না। অপিচ. তাম্বূল-সেবা ভারতীয় রীতি স্বীকার করিতে হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দো-নেসিয়ায় প্রচলিত কোল-ভাষা-সম্পৃক্ত মোন-খ্মের প্রভৃতি ভাষার ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগের রীতি-অনুসারে 'তম্'-উপসর্গ-যোগে পর্ণার্থক 'বল্' শব্দ মিলিত হইয়া প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল- বা মোন-খ্মের-ভাষীদের মধ্যে *'তম্বল্' এইরূপ কোনও রূপ প্রচলিত ছিল (যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত কোল-সম্পৃক্ত মোন-খ্মের ভাষায় মিলে), এবং আর্য্যভাষা সংস্কৃতে এই শব্দ 'তাম্বূল'-রূপে গৃহীত হইয়াছে। উপসর্গ-বিহীন '*বল্' রূপও পর্ণার্থে ভারতে কচিৎ ব্যবহৃত হইত, কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই জাতীয় ভাষায় এখনও হয়। এখনও 'বল্' শব্দ 'পান'-অর্থে খাসিয়া ভাষায় মিলে; এবং তদ্ভিন্ন দুইটী বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে অনুপসর্গ 'বল্' শব্দ পাওয়া যায়—'বার' ও 'বর' রূপে—'বারুই' ও 'বরোজ' শব্দদ্বয়ে। 'বারুই' শব্দের প্রাচীন রূপ 'বারয়ী', খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাম্রশাসনে 'বারয়ী-পড়া' (=বারুই পাড়া)-রূপে লিখিত একটী গ্রামের নামে পাওয়া যায়। 'বারুই' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ করা হইয়াছে 'বারুজীবিন্'। 'বারু' কি? পান বলিয়াই অনুমিত হয়—মোন-খ্মের ও তৎসম্পৃক্ত ভাষার পান-বাচক 'বল্' শব্দের নজীরে। 'বারুই—বরোজ', এই দুইটী অন্ততঃ আংশিকভাবে বাঙ্গালার দুইটী দেশী শব্দ—এ দেশে প্রচলিত অনার্য্য-ভাষা হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার 'তাঁবোল', আধুনিক বাঙ্গালার 'তাম্লী' শব্দও তদ্রূপ।

বাঙ্গালা ভাষার শত শত প্রাকৃতজ ও দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য্য-(মোন-খ্মের, কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সৃজ্যমান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য এই সকল শব্দের সংগ্রহ করিয়া আশু অভিধান-ভুক্ত করিয়া ফেলা দরকার। পল্লীগ্রামে থাকিয়া কাজ করিবার সুবিধা যাঁহাদের আছে, সেইরূপ সত্যানুসন্ধিৎসু স্বজাতিবৎসল মাতৃভাষানুরাগী বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই Sir George Abraham Grierson স্তর জর্জ্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের Bihar Peasant Life-এর মত বইকে আদর্শ করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। জিজ্ঞাসা বা অভিনিবেশের সহিত শ্রবণ ও লিখনের দ্বারা তাঁহারা ভারত-বিদ্যার ভাণ্ডারে, কেবলমাত্র এইরূপ একটী সংগ্রহের সাহায্যে, এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া যাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য যাবৎ এই সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা থাকিবে, তাবৎ সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে।

স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি

বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, তদ্দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালার (বিশেষতঃ চলিত ভাষার) রূপ, স্বর-ধ্বনি বিষয়ে অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া গিয়াছে। গত ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা স্বরধ্বনির বিকার বা বিকাশ এই উচ্চারণ-রীতিগুলিকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারে অজ্ঞাত, সুতরাং এবম্প্রকার উচ্চারণ-রীতির আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ করেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারা বাঙ্গালার নিজস্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও তদবলম্বনে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির আলোচনা বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার গতি সম্যগ্‌ভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্দ্ধ-তৎসম (অর্থাৎ বিকৃত বা অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্কৃত) শব্দগুলির পরিবর্ত্তনের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ নিয়ম কয়টীর সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই সকল নিয়ম মৎপ্রণীত Origin and Development of the Bengali Language পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪—৪০২, এবং অন্যত্র)। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ের বাহুল্য-ভাবে

পুনরবতারণা করিবার আবশ্যকতা নাই। আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মক নাম বাঙ্গালায় নাই —অন্ততঃ আমি পাই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারণ-রীতির নাম নাই; কারণ, সংস্কৃতে এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশই হয় নাই; এবং বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যে কেহও নূতন নাম সৃষ্টি করিয়াও দেন নাই। ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় কিন্তু এই সকল উচ্চারণ-সূত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা ইংরেজী, ফরাসী, জারমান প্রভৃতি ভাষায় নির্দ্ধারিত হইয়া আজকাল সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার এই উচ্চারণ-রীতির পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে সর্ব্বত্র গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে— হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটী মারহাট্টী এবং তেলুগু কানাড়ী তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় আবশ্যক-মত ব্যবহারের যোগ্য। বিষয়টীকে সুবোধ্য করিবার জন্য উপর্য্যুল্লিখিত উচ্চারণ-রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য্য হইবে।

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নিম্নলিখিত কয়টী পর্য্যায়ে বা শ্রেণীতে এই সব পরিবর্ত্তনকে ফেলা যায়। যথা :—

[১] চলিত ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ

ভদ্র মৌখিক ভাষায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত নূতন সাহিত্যের ভাষায়, নিয়ে আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। যথা—'দেশী' > 'দিশি'; 'ছোরা', হ্রস্বার্থে 'ছোরী' স্থানে 'ছুরী'; 'ঘোড়া', স্ত্রীলিঙ্গে 'ঘোড়ী' স্থলে 'ঘুড়ি'; 'দে' ধাতু —'আমি দেই' স্থলে 'দিই' বা 'দি', কিন্তু 'সে দেএ' স্থলে 'দেয় (ত্তায়)'; 'শো' ধাতু—'আমি শোই' না হইয়া 'আমি শুই', কিন্তু 'সে শোয়'; 'শুন্' ধাতু—'আমি শুনি', কিন্তু 'সে শুনে' স্থলে 'সে শোনে'; 'কর্' ধাতু—'আমি ক-রি' স্থলে 'কোরি', কিন্তু 'সে করে'—এখানে অ-কার ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; 'বিলাতী' > 'বিলেতি' > 'বিলিতি'; 'উড়ানী' > 'উড়ুনী'; সংস্কৃত 'শেফালিকা' > প্রাকৃত 'শেহালিআ' > অপভ্রংশ 'শেহলিঅ' > বাঙ্গালা 'শিউলি'; ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, 'একটা, দুইটা, তিনিটা' > 'একটা, দুটা, তিন্‌টা' > 'একটা, দুটো, তিনটে'; 'ইচ্ছা' > 'ইচ্ছে'; 'চিঁড়া' > 'চিঁড়ে'; 'মিথ্যা' > 'মিথ্যে'; 'ভিক্ষা' > 'ভিক্ষে'; 'পূজা' > 'পূজো'; 'মূলা' > 'মূলো'; 'তূলা' > 'তূলো'; ইত্যাদি।

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় আজকাল সাধারণ, কিন্তু এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্য ভাষার লক্ষণ ছিল। শব্দের মধ্যেকার বা অন্তের ই-কার বা উ-কারের, পূর্ব্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বেই আসিয়া যাওয়া এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিশেষত্ব (পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি উপভাষা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার ই-কারে রূপান্তরিত হইয়া যায়)। যথা,—'আজি, কালি' > 'আইজ্, কাইল্'; 'গ্রন্থি' > 'গন্ঠি' > 'গাঁঠি' > 'গাঁইট'; 'সাধু' > 'সাউধ,

সাইধ'; 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা'; 'সাথুআ' > 'সাউথুআ' > 'সাইথুআ'; 'করিতে' > 'কইর্‌তে'; 'করিয়া' > 'কইর্যা'; 'হরিয়া' > 'হইর্যা'; 'জলুআ' > 'জউলুআ, জইলুআ'; 'চক্ষু' > 'চখু' > 'চউখ, চইখ'; ইত্যাদি।

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীরথী নদীর তীরের এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত ভাষায় বিশেষ প্রবল। বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত; বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায়, এবং কচিৎ পশ্চিমবঙ্গের সুদূর প্রান্তের ভাষায়। এই পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার। শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থিত ই-কার বা উ-কার পূর্ব্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে তাহা পূর্ব্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়া দেয়। যথা—'আজি, কালি' > 'আইজ, কাইল' > 'এজ, কেল' (প্রাচীন গ্রাম্য উচ্চারণ, কলিকাতার আশে পাশে চব্বিশ-পরগনায় হুগলীতে ৮০।১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল—'আলালের ঘরের দুলাল'-এ 'বাহুল্য' (অর্থাৎ বাহাউল্লা) নামে যে মুসলমান পাত্রটীর কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ প্যারীচাঁদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন,—শিক্ষা ও সাধুভাষার প্রভাবে এই প্রকারের উচ্চারণ এখন আর স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে শ্রুত হয় না); 'চারি' > 'চাইর' > 'চের', যথা 'চাইরের পাঁচ' > 'চেরের পাঁচ' = $\frac{5}{4}$; 'গাঁঠি' > 'গাঁইট' > 'গেঁট'—যথা 'মনে মনে গেঁট দিচ্ছে; গেঁটের কড়ি'; 'সাধু' > 'সাউধ' > 'সাইধ'—'সেধ', যথা 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের'; 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা' > 'রেখ্যা' > 'রেখে';

'সাথুআ' > 'সাউথুআ' > 'সাইথুআ' > 'সেথো' ; 'করিতে' > 'কইর্‌তে' > 'ক'র্‌তে' = 'কোর্‌তে' ; 'করিয়া' > 'কইর‍্যা' > 'ক'র‍্যা' > 'ক'রে' = 'কোরে' ; 'হরিয়া' > 'হইর‍্যা' > 'হ'র‍্যা' > 'হ'রে' = 'হোরে' ; 'জলুআ' > 'জইলুআ' > 'জ'লো' = 'জোলো' ; 'চক্ষু' > 'চখু' > 'চউখ্', 'চইখ্' > 'চোখ' ইত্যাদি।

চলিত ভাষার প্রভাবে এই ধরণের পরিবর্ত্তনের ফল বহু রূপ সাধুভাষায়ও প্রবেশলাভ করিয়াছে : যথা—'ছালিয়া' > 'ছেলে' ; 'মাইয়া' > 'মেয়ে' ; 'থাকিয়া' > 'থেকে' ; 'জলুয়া' > 'জ'লো' ; 'জালিয়া' > 'জেলে' ইত্যাদি।

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্ত্তন অন্য ধরণের—প্রথম তিন প্রকারের পরিবর্ত্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবর্ত্তন সংস্কৃতে মেলে। যথা—'চল্' ধাতু—'চলে', কিন্তু ণিজন্ত 'চালে' (এতদ্ভিন্ন অন্য ণিজন্তও আছে—'চালায়', 'চলায়') [তুলনীয় সংস্কৃত 'চলতি—চালয়তি'] ; 'পড়্' ধাতু পতনে— পড়ে', ণিজন্ত 'পাড়ে' ; 'টুট্' ধাতু—'টুটে', ণিজন্ত 'তোড়ে'। এখানে অবস্থা-গতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির স্বতঃই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—'চল্—চাল্', 'পড়্—পাড়্', 'টুট্—তোড়্'।

এক্ষণে উপর্য্যুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্ত্তন-রীতির অন্তর্নিহিত কারণ বা প্রেরণাটী কি, তাহা বুঝিয়া, বাঙ্গালায় ইহাদের কি কি নাম দেওয়া সমীচীন হইবে, তাহার বিচার করা যাউক।

[১] প্রথম প্রকারের পরিবর্ত্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। 'দেশী' > 'দিশি'—এখানে প্রথম অক্ষরের এ-কার পরবর্ত্তী অক্ষরের ঈ-কারের (ই-কারের) প্রভাবে, পরবর্ত্তী ই-ধ্বনির সহিত সঙ্গতি

রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ই (ঈ)-র উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রসৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে উঠে; এ-কারের বেলায়, উচ্চে উঠে না, একেবারে নিম্নেও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। বাঙ্গালা উচ্চারণে, পরবর্ত্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ব্ববর্ত্তী এ-কার, উচ্চারণের সময়েই এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে, জিহ্বা উত্তোলিত হইয়া পড়ে; ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্ত্তন ঘটে। উ-কার এবং ও-কার উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়া বৃত্তাকার ধারণ করে; মুখাভ্যন্তরে আকর্ষিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় নিম্নে অবস্থান করে। 'ছোরা' শব্দের হ্রস্বার্থে ঈ-প্রত্যয়-জাত 'ছোরী' শব্দের উচ্চারণে, প্রথম অক্ষরের ও-কার পরবর্ত্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা আকর্ষিত হয়; এবং ঈ বা ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে আনীত হয়,—ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্ত্তন। তদ্রূপ—'করে, করা' পদে, এ-কার জিহ্বার মধ্য-অবস্থানজাত, আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থানজাত; এই জন্য ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে পড়িয়াও অ-কার নিম্নেই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ বদলায় না; কিন্তু 'ক-রি=কোরি', এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হয়, ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়। তদ্রূপ 'কর্-উক্,' 'ক-রুক্=কোরুক্'—এখানে ক-এর অ-কার,

'উক্'-এর উ-কারের আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া গিয়াছে।

পার্শ্বের সংলগ্ন চিত্রদ্বারা স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কি করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত 'ই, উ'র প্রভাব বা আকর্ষণে এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কার হয়, এবং এই প্রকারের নানা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালা শব্দের অভ্যন্তরস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই উ'-র প্রভাবে মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, ও' এবং নিম্নাবস্থিত স্বর 'আ, অ' যথাক্রমে 'ই, উ' এবং 'এ, ও'-তে পরিবর্তিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, অ্যা' তথা 'ও', 'অ'-র প্রভাবে পড়িয়া উচ্চে আকর্ষিত হইতে পারে না; 'অ'-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ' মধ্যস্থানে নামিয়া আসিয়া যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' হইয়া যায়। উঁচু নীচুকে উঁচুতে টানে, নীচু উঁচুকে নীচে নামাইয়া লয়—ইহাই হইতেছে এই প্রভাবের মূল কথা। এই অনুসারে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের রূপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

ধাতুতে স্বরধ্বনি

'অ ই উ এ ও'

থাকিলে, প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে যদি 'ই উ' আইসে, তাহা হইলে পূর্বোল্লিখিত ধাতুর স্বরধ্বনি যথাক্রমে

'ও ই উ এ (ই) উ'

রূপে অবস্থান করে; এবং

প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে 'এ (বা য়), আ, অ, ও' আসিলে, ধাতুর স্বর যথাক্রমে

'অ এ ও অ্যা (এ ও'

রূপে অবস্থান করে। যথা—

'চল্' ধাতু—'চল্'+'-অহ'='চলহ, চলো'; 'চল্'+'-এ'= 'চলে'; 'চল্'+'-ই'='চলি=চোলি'; 'চল্'+'-আ'= 'চলা'; 'চল্'+'-উক্'='চলুক্'='চোলুক্'; 'চল্'+'-অন্ত'='চলন্ত';

'কিন্' ধাতু—'কিন্'+'-এ' = 'কিনে'= 'কেনে'; 'কিন্'+ '-অহ'='কিনহ'='কেন' (তুমি ক্রয় কর); 'কিন্'+'-ই'= 'কিনি'; 'কিন্'+'-উক্'='কিনুক'; 'কিন্'+'-আ'='কিনা, কেনা;'

'শুন্' ধাতু—'শুন্'+'-এ' = 'শোনে'; 'শুন্'+'-অহ'= 'শুনহ', 'শুন' = 'শোনো' (তুমি শ্রবণ কর); 'শুন্'+'-ই'='শুনি'; 'শুন্'+'-উক্'='শুনুক'; 'শুন্'+'-আ'='শুনা'='শোনা';

'দেখ্' ধাতু—'দেখে'='দ্যাখে' (এ > অ্যা); 'দেখহ' > 'দেখ'='দ্যাখো'; 'দেখি, দেখুক'; 'দেখা'='দ্যাখা';

'দে' ধাতু—'দেয়=দ্যায়'; 'দেই=দিই'; 'দেঅহ > দেও > দ্যাও', পরে 'দাও'; 'দেউক > দিউক > দিক্'; 'দেআ'='দেওয়া';

'দোল্' ধাতু—'দোলে; দোলো; দুলি; দুলুক্, দোলা';

'শো' ধাতু—'শোয়; শোও; শুই; শুক্; শোয়া'।

পরবর্তী স্বরধ্বনির আকর্ষণে বা তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য যেমন প্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীতও ঘটিয়া থাকে,—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরেরও পরিবর্তন হয়। যথা—'বিনা' > 'বিনে' (ই-র আকর্ষণে

আ-কারের উচ্চে এবং মুখের সম্মুখভাগে আনয়ন, ফলে এ-কারে পরিবর্ত্তন) ; তদ্রূপ 'ইচ্ছা—ইচ্ছে, চিন্তা—চিন্তে, হিসাব—হিসেব, গিয়া—গিয়ে, দিয়া—দিয়ে, বিলাত—বিলেত' ; ইত্যাদি। এবং পূর্ব্ববৎ অগ্র-গামী উ-র প্রভাবে পরস্থিত আ-কারের ও-তে পরিবর্ত্তন ঘটে ; যথা—'পূজা—পূজো, ধূনা—ধূনো, সুহা—সুও, জুয়া—জুও' ; ইত্যাদি।

এই পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম-হেতু বাঙ্গালার পূর্ণরূপ শব্দগুলি (খাঁটী বাঙ্গালা, তৎসম ও বিদেশী) চলিত ভাষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যথা 'বিলায়তী > বিলাতী > বিলেতি > বিলিতি ; পিঠালী > পিঠলী > পিঠোলী > পিঠুলী ; উড়ানী > উড়োনী > উড়ুনী ; উনানী > উনোনী > উনুন ; সন্ন্যাসী = সন্নিয়াসী > সন্নেসী > সন্নিসী ; কুড়ালী > কুড়োলী > কুড়ুলী > কুড়ুল ; মাদল + ঈ = মাদলী > মাদোলী > মাদুলী ; উৎসর্গ > উচ্ছোগ্‌গ > উচ্ছুগ্‌গু ; নিরামিষ্য > নিরামিষ্যিয় < নিরেমিষ্যি, নিলেমিষ্যি > নিলিমিষ্যি (গ্রাম্য, স্ত্রীলোকের ভাষায়)' ; ইত্যাদি।

এইরূপ পরিবর্ত্তন-রীতিকে কি নাম দেওয়া যায় ? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই ভাষায় ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় ; যথা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে—'চোর—চোরিণী' হইতে 'চুরিণী', 'কোয়েলী' হইতে 'কুয়িলী', 'ছিনারী'-র পার্শ্বে 'ছেনারী', 'পুড়ি'র পার্শ্বে 'পোড়া', ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্ত্তন অন্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। যেমন তুর্কীতে at 'আৎ' মানে ঘোড়া, at-lar 'আৎ-লার্' = ঘোড়াগুলি ; ev 'এভ্' মানে বাড়ী, ev-ler 'এভ্-লের্' মানে বাড়ীগুলি ; এখানে at শব্দে আ-ধ্বনি থাকায় বহুবচনের প্রত্যয়ে-ও আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টী lar রূপে সংযুক্ত হইল ; এবং ev শব্দে

এ-ধ্বনি থাকায় প্রত্যয়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত ler। উরাল-গোষ্ঠীয় ভাষায়, আল্তাই-গোষ্ঠীয় ভাষায় (তুর্কী যাহার অন্তর্গত), তেলুগু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্যত্র এই রীতি মেলে। এই পরিবর্তন আবার স্বরের উচ্চারণকে কেবল নিম্ন হইতে উচ্চে বা উচ্চ হইতে নিম্নে আনয়ন করিয়াই হয় না—জিহ্বাকে অগ্রভাগ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ ভাগে আনয়ন করিয়া, ও অধরোষ্ঠকে প্রসৃত বা বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে—এবং ফলে ওষ্ঠদ্বয়কে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত 'উ' 'ও' 'অ'-র এবং অধরোষ্ঠকে সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 'ই' 'এ' 'অ্যা'র বিকারে নানা প্রকার অদ্ভুত স্বরধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে—যে সকল স্বরধ্বনি আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্যক মত রোমান বর্ণমালায় ö ü ä y ɯ প্রভৃতি নানা অক্ষরের সাহায্যে সেগুলি দ্যোতিত হয়।

এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ Vocalic Harmony বা Harmonic Sequence বলিয়াছেন (জারমানে Vokal-harmonie, ফরাসীতে Harmonie vocalique বা Assimilation vocalique). বাঙ্গালায় এই রীতির নাম **স্বর-সঙ্গতি** দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি।

একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার—যেখানে আদ্য অ-কার নিষেধ-বাচক, সেখানে ইহার উচ্চারণ 'অ'-ই থাকে, স্বর-সঙ্গতি হয় না; যথা—'অ-তুল' (কিন্তু নাম অর্থে 'ওতুল'), 'অ-সুখ', 'অ-ধীর', 'অ-স্থির', 'অ-দিন' (কিন্তু 'অতিথি'-র উচ্চারণ 'ওতিথি'), ইত্যাদি। এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পারিয়া চলতি ভাষা

ব্যবহারের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ ভুল করিয়া 'ও' উচ্চারণ করেন।

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি লইয়া খুঁটিনাটী আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণবিপর্য্যয়—ই-কার বা উ-কার, ব্যঞ্জনের পরে নিজ স্থানের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে আইসে; যেমন 'কালি' > 'কাইল্', 'সাধু' > 'সাউধ্'। কিন্তু ইহা কেবল বর্ণ-বিপর্য্যয় মাত্র নহে—এক হিসাবে ইহা আগম, বা পূর্ব্বাভাস-হেতুক আগমও বটে: যেমন 'সাথুআ' > 'সাউথুআ': এখানে 'থু'-এর 'উ' রহিয়া গেল, ওদিক 'থ'-এর পূর্ব্বেও উ-কার আসিয়া গেল। তদ্রূপ, 'করিয়া' > 'কইর‍্যা' এখানেও 'রি'-র ই-কার একেবারে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া 'র' এর আগে চলিয়া গেল না, 'র'-এর আগে পূর্ব্বাভাসের মত, ই-কার আসিয়া গেল—উভয় স্থানেই ই-কার রহিল। সুতরাং কেবল মাত্র বর্ণবিপর্য্যয় অথবা ই-কার (বা উ-কার) আগম বলিলে চলে না। 'পূর্ব্বাভাস-আগম' বলিলে কতকটা ব্যাখ্যা হয় বটে। সংস্কৃতে এইরূপ পূর্ব্বাভাসাত্মক আগম দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতের স্বস্থানীয় অবেস্তার ভাষায় মিলে: যথা—সংস্কৃতে 'গিরি' = অবেস্তায় 'গইরি' (মূল ইরানীয় রূপ '*গরি'); সংস্কৃতে 'গচ্ছতি'—অবেস্তায় 'জসইতি' (মূল ইরানীয় রূপ—'*জসতি'); সংস্কৃতের 'সর্ব্ব', অর্থাৎ 'সর্‌উঅ'—অবেস্তায় 'হউর্‌ব' অর্থাৎ 'হউর্‌উঅ' (মূল ইরানীয় রূপ '*হর্‌ব = হর্‌উঅ')। ভারতবর্ষে বৈদিকের বিকারে জাত প্রাকৃতেও ক্বচিৎ এইরূপ পূর্ব্বাভাসাত্মক ই- ও উ-বর্ণের ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ আছে: যথা—সংস্কৃত 'কার্য্য = কার্‌ইঅ' শব্দ প্রাকৃত

অর্দ্ধ-তৎসম রূপে '*কাইর্য়্ইঅ', '*কাইর্য়অ' = '*কাইর'-তে প্রথম রূপান্তরিত হয়; পরে অন্তঃসন্ধি করিয়া দাঁড়ায় '*কাইর > কের' - ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয়-হিসাবে প্রাকৃতে এই কের-পদ প্রচলিত হয়; 'পর্য্যন্ত = পর্য়্যন্ত = পর্য়্ইঅন্ত = পরিঅন্ত > *পইরন্ত > পেরন্ত'; 'পর্ব্ব' = 'পর্ব্‌ব = পর্‌উঅ' > '*পউর্‌উঅ > পউর > পোর', ইত্যাদি দুই চারিটী পদ প্রাকৃতে পাওয়া যায়, এবং এগুলি এই পূর্ব্বাভাসাত্মক বিপর্য্যয়ের বা আগমের ফল।

ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বরধ্বনির এই প্রকারের গতির নামকরণ করিয়াছেন Epenthesis (ফরাসীতে Epenthèse)। শব্দটী গ্রীক ভাষার একটী প্রাচীন শব্দ। গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবল মাত্র 'আগম', এবং এই প্রকার পূর্ব্বাভাসাত্মক আগমকেও জানাইবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত: যথা—bainō, পূর্ব্বরূপ *baniō; leipō, পূর্ব্বরূপ *lepiō; eimi, পূর্ব্বরূপ emmi, তৎপূর্ব্বে *esmi; ইত্যাদি। অক্স্‌ফোর্ড্‌ ডিক্‌শুনরীর মতে, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজী ভাষায় কেবল 'আগম' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় এই শব্দের প্রধান অর্থ—the transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—অন্তঃস্থ বর্ণের পূর্ব্ব-স্থিত অক্ষরে আনয়ন। গ্রীক Epenthesis শব্দটী ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাভাসাত্মক ধ্বনি-বিপর্য্যয় বা ধ্বন্যাগমকে স্বল্পাক্ষর সুখোচ্চার্য্য একপদময় নামের দ্বারা বাঙ্গালায় অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক Epenthesis শব্দের অনুরূপ একটী শব্দ, গ্রীকের স্থানীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতে থাকিলে অনুসন্ধান করিয়া

বাহির করিতে হয় ; এবং সংস্কৃতে এরূপ শব্দ বিদ্যমান না থাকিলে, গ্রীক শব্দটীর ধাতু ও প্রত্যয় ধরিয়া অনুরূপ সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে নূতন একটী শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যায়। গ্রীক Epenthesis শব্দটীর বিশ্লেষ এই—epi উপসর্গ+in উপসর্গ+thesis শব্দ ; thesis শব্দ আবার ক্রিয়া-বাচক thē (থে) ধাতুতে -sis প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন। epi উপসর্গের অর্থ 'উপরে', 'অধিকন্তু' (upon, in addition to) ; en-এর অর্থ 'ভিতরে' ; এবং thesis অর্থে 'স্থাপন', বা 'রক্ষণ'। গ্রীক epi-র প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 'অপি' ;—'উপরে' অর্থে 'অপি' উপসর্গের প্রয়োগ হইত, 'নিকটে, সংযোগে, অধিকন্তু, অভ্যন্তরে'—এই সকল অর্থেও ব্যবহৃত হইত ; 'অধিকন্তু'—এই অর্থে এই উপসর্গের অব্যয়-রূপে ব্যবহারও আছে ; বৈদিক সংস্কৃতে ধা-ধাতুর সঙ্গে 'অপি' ব্যবহৃত হইয়া 'অপিধান' এবং 'অপিধি' এই দুই পদ বিদ্যমান ছিল—যাহাদের অর্থ 'আবরণ' ; 'অপি' উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া 'পি' রূপ ধারণ করিয়াছিল—যথা—'অপিধান—পিধান' ; 'অপি'+'নহ্'= 'পিনহ্' ইত্যাদি। en-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে নাই ; en-এর অর্থ 'ভিতরে' ; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে 'নি' (যেমন—'নি-হিত, নি-বাস' ইত্যাদি) ; গ্রীক ধাতু thē-র প্রতি-রূপ হইতেছে সংস্কৃত ধাতু 'ধা', এবং -sis প্রত্যয়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ '-তিস্' বা '-তিঃ' ; thesis='ধিতিস্' ; বৈদিক ভাষায় 'ধিতি' পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার রূপ হয় 'হিতি'। তাহা হইলে দাঁড়ায়, epi-en-thesis=অপি-নি-হিতি ; বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য, এই পূর্ব্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্য্যয়কে অতএব

অপিনিহিতি বলা যাইতে পারে ;—'উপরে বা অধিকন্তু আভ্যন্তরীণ সংস্থাপন'—এইরূপ অর্থ এই নবসৃষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে ; এই মৌলিক অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ অনায়াসে দ্যোতিত হইতে পারে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অর্থ-গত সমতাও পাওয়া যাইবে। 'অপিনিহিতি'-র বিশেষণে 'অপিনিহিত' শব্দ (epenthetic অর্থে) প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির প্রসারেই ঘটিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' বা 'উ' আগে চলিয়া আইসে, তাহা পূর্ব্বের অক্ষরে অবস্থিত 'অ' বা 'আ' বা অন্য স্বরের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার সঙ্গে একযোগে diphthong অর্থাৎ সংযুক্ত-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি করে ;—যেমন, 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা'—এখানে সংযুক্ত-স্বর 'আই' ; 'করিয়া' > 'কইর‍্যা'—এখানে সংযুক্ত-স্বর 'অই' (স্বরসঙ্গতির নিয়মে 'অই'-এর 'অ' ও-কারে পরিবর্তিত হয়, ফলে উচ্চারণে 'ওই'); 'দীপবৃক্ষ' > 'দীবরুক্‌খ' > 'দিঅরূখা' > 'দিঅউরূখা' > 'দেউরূখা' (এখানে সংযুক্ত-স্বর 'এউ') > 'দেইরূখো' > 'দেরূখো' ; 'মাছুয়া' > 'মাউছুয়া' (এখানে সংযুক্ত-স্বর 'আউ') > 'মাইছুয়া' (এখানে 'আউ'-এর 'আই'-তে পরিবর্তন) > 'মেছো' ; ইত্যাদি। এই সকল সংযুক্ত-স্বরের দ্বিতীয় অঙ্গ 'ই' (মূল 'ই', এবং উ-কারের পরিবর্তনে জাত 'ই'), পূর্ব্ব-স্বরের সহিত সন্ধিযোগে মিশিয়া যায় ('রাইখ্যা' > 'রেখ্যা' > 'রেখে' ; 'মাউছুয়া' > 'মাইছো' > 'মেছো'), কিংবা লুপ্ত হইয়া যায় ('দেউরূখা' > 'দেইরূখো' > 'দেরূখো' ; 'কইর‍্যা' > 'ক'র‍্যা' > 'ক'রে')। অ-কারের পরে এই অপি-

নিহিত 'ই' আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ ; কিন্তু পূর্ব্বস্থিত অ-কারকে ও-কারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, এই অপিনিহিত 'ই' নিজ প্রভাব-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। য-ফলার 'য়' (=ইঅ)-তে যে ই-ধ্বনি বিদ্যমান আছে, তাহা মধ্যযুগের বাঙ্গালায় (ও মধ্যযুগের উড়িয়ায়) অপিনিহিত হইয়া উচ্চারিত হইত ; যথা—'সত্য=সত্তিঅ > সইত্তিঅ, সইত্ত ; পথ্য=পৎথিঅ > পইথিঅ > পইথ ; বাহ্য=বাজ্ঝিঅ > বাইঝ (মধ্যযুগের উড়িয়ায় 'বাহিজ') ; যোগ্য = যোগ্গিঅ > যোইগ্গিঅ > যোইগ্গ'। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ অপিনিহিত য-ফলা বিদ্যমান আছে,—পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালায় ইহার অস্তিত্ব এখনও লুপ্ত হয় নাই (যেমন 'সত্য > সইত্ত, পথ্য > পইথ ; বাহ্য=বাইজ্ঝ ; যোগ্য= যোইগ্গ')। চলিত ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং লোপের পূর্ব্বে স্বরসঙ্গতি-অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী মূল অ-কারকে ও-কারে, এবং মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে ; নয় প্রথম অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজ পূর্ব্বস্থানে পূর্ণ ই-কারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ; যথা—'সত্য=সত্তিঅ > সইত্তিঅ > সইত্ত > (১) সোইত্ত, (২) সোইত্তিঅ > (১) সোত্তো (শোত্তো), (২) সোত্তি ('শোত্তি'—'সত্যি'রূপে লিখিত হয়) ; পথ্য=পৎথিঅ > পইৎথিঅ, পইৎথ > (১) পোইৎথ, (২) পোইথিঅ > (১) পোথো, (২) পোথি (=পথ্যি) ; বাহ্য=বাজ্ঝিঅ, বাইজ্ঝ > (১) বাজ্ঝো, (২) বাজ্ঝি, বাজ্ঝে ; যোগ্য=যোগ্গিঅ > যোইগ্গিঅ, যোইগ্গ > (১) যোইগ্গ, (২) যোইগ্গি > (১) যোগ্গো, (২) যুগ্গি' ; ইত্যাদি। 'ক্ষ'-র উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্গালায় ছিল 'খ্য' ('ক্ষ'—এই সংযুক্ত অক্ষরের

নাম বা বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়—'ক-য়ে মূর্দ্ধন্য-ষ-য়ে খিঅ'), এবং 'জ + ঞ = জ্ঞ'-এর উচ্চারণ ছিল 'গ্যঁ' ; উচ্চারণে য-ফলা আইসে, এবং এই য-ফলাও সত্যকার য-ফলার মত কার্য্য করে ; যথা—'লক্ষ্য = লখ্য = লক্‌খিঅ > লইক্‌খিঅ, লইক্‌খ > লোক্‌খি (কলিকাতার 'গ্রাম্য' উচ্চারণে), লোক্‌খো ; রক্ষা = রক্‌খিআ > রইক্‌খিআ, রইক্‌খ্যা > রোক্‌খ্যা, রোক্‌খে, রোক্‌খা ; আজ্ঞা = আগ্যাঁ = আগ্‌গিঁআ > আইগ্‌গিঁআ, আইগ্‌গ্যাঁ > এঁগ্‌গেঁ, আঁগ্‌গেঁ, আঁগ্‌গাঁ' ইত্যাদি।

পুরাতন বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দ এই অপিনিহিত ও তদনন্তর এই প্রকারের পরিবর্ত্তনে নূতন আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে ; যেমন—'বৎস-রূপ > বচ্ছরূব > বচ্ছরূঅ > বাছরূ, বাছরু > বাছউর্ > বাছোউর্ > * বাছুউর, বাছুর ; কামরূপ > কামরূব > কাবঁরূঅ > কাবঁরূ, কাবঁরু > কাবঁউর্ > কাবোঁউর্ > * কারঁউর, কারুঁর—বাঙ্গালা পুঁথিতে কাঙুর (কাঙুর-কামিখ্যা), সপ্তদশ শতকের ইংরেজ ভ্রমণকারীর লেখায় Caor' ; ইত্যাদি।

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব্ব-স্বরের পরিবর্ত্তন —ইহাই হইল আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের স্বরধ্বনি-বিকারের মূল কথা। ইহা বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য কোনও কোনও আর্য্যভাষায় মিলে। যেমন ছোটনাগপুরে প্রচলিত ভোজপুরিয়াতে 'কাটি, মারি' (= কাটিয়া, মারিয়া) > 'কাইট্, মাইর্' ; পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ইহা পাওয়া যায় : 'জঙ্গল' শব্দের প্রথমাতে 'জঙ্গলু > * জঙ্গউল্ > জঙ্গুল্', সপ্তমীতে 'জঙ্গলি > * জঙ্গইল্ > জঙ্গিল্' ; গুজরাটীতে কচিৎ মেলে : যেমন, 'ঘরি (= গৃহে) > * ঘইর্ > ঘের' । এতদ্ভিন্ন সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্ত্তন খুবই সাধারণ।

ভারতের বাহিরের বহু ভাষায়ও এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য্য) ভাষার Germanic জরমানীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই সাধারণ, এবং এই ভাষা-গুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল। ইংরেজী ও জরমান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। প্রাচীন ইংরেজী *Franc-isc > Frencsc (isc-এর i ই-কারের অপিনিহিতি, *Fraincsc রূপে পরিবর্ত্তন, পরে a আ-কারের i ই-কারের প্রভাবে পড়িয়া e এ-কারে পরিণতি) > আধুনিক ইংরেজী French; প্রাচীন ইংরেজী একবচনে mann (=মানুষ), বহুবচনে *mann-i, তাহা হইতে menn, আধুনিক ইংরেজী man—বহুবচনে men; fōt (=পা)—বহুবচনে *fōt-iz—পরে fœt, তাহা হইতে fēt, আধুনিক foot—feet; প্রাচীনতম ইংরেজী *haria (হারিয়া=সেনা), প্রাচীন ইংরেজী here (=হেরে; এখন এই শব্দটী লুপ্ত); তদ্রূপ brother—brether (brethren), জরমানের Bruder—Brüder (Brueder), Food—Feed প্রভৃতি বহুবচনের ও ক্রিয়ার রূপের উদ্ভব এই নিয়মে।

এই ধ্বনি-পরিবর্ত্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায়? জরমান ভাষায় ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জরমান পণ্ডিতেরা ইহার একটী বেশ নামকরণ করিয়াছেন; Klopstock ক্লপ্‌ষ্টক্ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম সৃষ্ট হইয়া প্রথম ব্যবহৃত হয়। নামটী হইতেছে Umlaut (উম্‌-লাউৎ); এই জরমান শব্দটী ইংরেজীতেও বহুশঃ গৃহীত হইয়াছে; ইংরেজীতে

আর একটা নাম ব্যবহৃত হয়—Vowel Mutation (ফরাসীতে Mutation Vocalique)। Umlaut শব্দটী জরমান উপসর্গ um-কে (যাহার অর্থ 'চতুর্দ্দিকে, অভিতঃ, প্রতি, উপরে', এবং সংস্কৃত 'অভি' উপসর্গ হইতেছে যাহার প্রতিরূপ), ধ্বনি-বাচক শব্দ Laut-এর সহিত যুক্ত করিয়া Umlaut শব্দের সৃষ্টি ; মোটামুটী অর্থ, 'ঘুরিয়া পরিবর্ত্তিত ধ্বনি'। এই Umlaut শব্দের আধারের উপর ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আমরা সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারি। আধুনিক জরমান Laut বিশেষ্য শব্দ ; Laut-এর ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে loud (বিশেষণ শব্দ) ; Laut, loud এই উভয়েরই আদি জরমানিক মূল-রূপ হইতেছে *hluda বা *xluδáz (খ্.লু.ধ.াজ্.) এবং ইহার আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল হইতেছে *klutós (ক্লুতোস্)—সংস্কৃতে যাহার পরিণতি হইতেছে śrutáḥ 'শ্রুতঃ'; শব্দটীর ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় *kleu বা *klu = সংস্কৃত śru 'শ্রু'। Um-laut-এর উপসর্গ ও ধাতু-প্রত্যয় ধরিয়া ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অভি-শ্রুত' ; যথা—
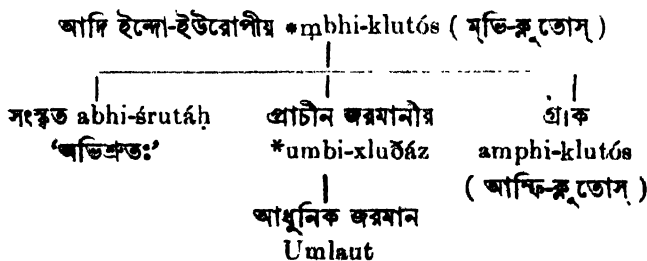
'অভিশ্রুত' কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের সংজ্ঞা-সূচক পদ নহে, ইহার রূঢ়ী অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে 'বিখ্যাত'। 'অভি + শ্রু' ধাতুর

অর্থ হইতে 'সম্যক্ রূপে শোনা', এবং এই অর্থে 'অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিশ্রুত্য' পদের প্রয়োগ আছে। অলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক বিকারকে বুঝাইবার জন্ত, 'Umlaut-এর' আক্ষরিক 'অভিশ্রুত' প্রতিরূপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় ক্ত-টাকে বদলাইয়া ক্তি-প্রত্যয়যুক্ত অভিশ্রুতি শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভালো হয়, এবং আমি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি। 'শ্রুতি' শব্দ উচ্চারণ-তত্ত্বে পূর্ব্বেই প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা জৈন প্রাকৃতের 'য়-শ্রুতি' ('বচন > বঅণ > বয়ণ,' 'মদন > মঅণ, ময়ণ', দুই উদ্‌বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে য়-কারের আগম)। এইরূপ য়-শ্রুতি বাঙ্গালাতেও আছে—যথা 'কেতক > কেঅঅ > কেয়া', কচিৎ 'কেওয়া= কেবা'; এবং য়-শ্রুতির অনুরূপ 'ব-শ্রুতি'-ও প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে আছে—যেমন, 'কেতক-ট- > কেঅঅড- > কেবঅড- > কেবড়- =কেওড়া' ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাকরণে 'য়-শ্রুতি' আছে, ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 'ব-শ্রুতি'-ও মেলে এবং পারিভাষিক শব্দ 'ব-শ্রুতি'-ও চলিবে; 'অভিশ্রুতি'তে তদ্রূপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। 'অভি'-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণ-তত্ত্বের আর একটী সংজ্ঞা প্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে—'অভি-নিধান'—পদের অন্তে হলন্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কৃতে একটী বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য এই শব্দ-দ্বারা দ্যোতিত হইত।

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্ত্তন ধাতুর মূল স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া। এই পরিবর্ত্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া ভারতের আদি আর্য্যভাষায় (সংস্কৃতে) ইহার মূল পাওয়া যায়। যেমন—'চলে < চলই < চলদি < চলতি;

চালে < চালেই < চালেদি < চালেন্তি < *চালয়ন্তি < চালয়ন্তি ; চল < চলঃ ; চাল < চালঃ ; টুটে < টুটই < টুট্টই < টুট্টদি < টুট্টন্তি < ত্রুট্যান্তি ; তোড়ে < তোড়ই < তোড়েই < তোড়েদি < তোড়েন্তি < তোটেন্তি < তোটয়ন্তি < ত্রোটয়ন্তি—টুট = ত্রুট্, তোড় = ত্রোট ; মন—মান ; দিশা—দেশ < দিশ্, দেশঃ' ; ইত্যাদি। ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই প্রকারের পরিবর্ত্তন, বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না,—'চল—চাল', 'পড়—পাড়' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে 'অ—আ'-র অদল-বদল যেখানে দেখা যায়, সেখান-ছাড়া অন্যত্র স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি আসিয়া প্রাচীন ধাতুগত স্বরধ্বনির নিয়মিত পরিবর্ত্তনকে উলট্-পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য ভারতীয় আর্য্যভাষাতেও এই পরিবর্ত্তন দেখা যায় ; যথা—'মর্‌না > মার্‌না, খিঁচ্‌না > খেঁচ্‌না, তপ্‌না > তার্‌না (তপ্যতে—তাপয়তি > তপ্পই—তাবেই > তপে—তাবে), জল্‌না—বার্‌না (জলতি—জালয়তি > জলই—বালেই > জলে—বারে), নিকল্‌না—নিকাল্‌না, কাট্‌না—কট্‌না, পাল্‌না—পল্‌না' ; ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অনুসারে ধাতুস্থ স্বরধ্বনির নূতন রূপ গ্রহণ করা, আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি নহে—প্রাকৃত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্তু একটী বিশিষ্ট রীতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং 'গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ',—এই তিনটী সংজ্ঞা-দ্বারা এই পরিবর্ত্তনের ধারাকে অভিহিত করিয়াছেন।

নিম্নে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কার্য্য প্রদর্শিত হইতেছে—

ধাতু (সরল বা মূল রূপ)		গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ
বদ্ ধাতু		বদ্ (বদতি, বশংবদ)	বাদ্ (অনুবাদ)	উদ্ (অনূদিত)
যজ্ ধাতু		যজ্ (যজতি, যজ্ঞ)	যাজ্, যাগ্ (যাজক, যাজ্ঞিক, যাগ)	ইজ্ (ইজ্যা, ইষ্টি)
বিদ্ ধাতু	বিদ্ (বিদ্যা)	বেদ্ (বেদ)	বৈদ্ (বৈদ্য)	
শ্রু ধাতু		শ্রউ=শ্রব, শ্রো (শ্রবণ, শ্রোতা)	শ্রৌ=শ্রাউ, শ্রাব্ (শ্রাবক, শ্রৌত)	
দুহ্ ধাতু	দুহ্, দুঘ্ (দুগ্ধ)	দোহ্ দোঘ্ (দোহন, দোগ্ধ)	দৌহ্, দৌঘ্ (দৌগ্ধ)	
নী ধাতু	নী (নীতি)	নই=নয়্, নে (নয়ন, নেতা,)	নৈ=নাই, নায়্ (নৈতিক, নায়ক)	
ধৃ ধাতু	ধৃর্, ধৃ (ধৃতি)	ধর্ (ধরণ, ধরা)	ধার্ (ধারণ)	
কৢপ্ ধাতু	কৢপ্ (কৢপ্তি)	কল্প্ (কল্পনা)	কাল্প (কাল্পনিক)	

ধাতুর স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্ত্তন সংস্কৃতের ন্যায় ভারতের বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মেলে ; এইরূপ পরিবর্ত্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর এক অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ; যথা—

গ্রীকে—

péda (=পাৎ, পাদ) póda pōs epi-bd-ai

dérkomai (*দর্শামি) dedorka (=দদর্শ) é drakon (অদর্শম্)

tithēmi (=দধামি) thōmos (=ধামঃ) thetós (=হিতঃ)

লাতীনে—

fidō (=বিশ্বাস করি)	foedus	fides (বিশ্বাস)
dō (দদামি)	dōnum (দানম্)	datus (দত্তঃ)
canō (গান করি)	cecini (আমি গাহিলাম)	cantus (গান)

গথিকে—

bindan (=bind বন্ধ্ ধাতু)	band	bundum	bundans
baíran (=bear ভৃ ধাতু)	bar	bērum	baúrans
saíxwan (=see সচ্ ধাতু)	saxw	sēxwum saíxwans (x=h)	
lētan (let)	laílōt	laílotum	lētans

ইংরেজীতে—

bind	bound	bounden	
bear	bore	boren, born	
see	saw	seen	
sing	sang	sung	song

প্রাচীন আইরীশে—

-tíag (আমি যাই)	techt (গমন)
melim (চূর্ণ করি)	mlith (চূর্ণ করা)
saidid (ব্যবস্থা করে)	síd (সন্ধি)
il (বহু)	uile (সকল)
lín (সংখ্যা)	lán (পূর্ণ)

প্রাচীন স্লাভে—

vedǫ (নয়ন করি) (voje-)voda vĕs = ved-som
pro-važdati = vadjati

tekǫ (দৌড়াই) tokŭ točiti těxŭ = teksom
pri-těkati, ras-takati

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বর অবিকৃত থাকিত না, নানা অবস্থায় তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিত। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবর্ত্তনের ধারাটী নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারার অন্তর্নিহিত সূত্রটীরও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর স্বরধ্বনির যে সকল পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহাদের গ্রন্থন-সূত্রটী হইতেছে এই:—প্রত্যয় বা বিভক্তির দ্বারায় যুক্ত হইয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, পদ-রূপে ব্যবহৃত হইবার কালে stress accent বা স্বরাঘাত এবং pitch accent বা উদাত্তাদি স্বরের প্রভাবে পড়িত এবং সেই ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল স্বরধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিবর্ত্তনে নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং কচিৎ-বা স্বরাঘাতের একান্ত অভাবে লুপ্ত হইয়াও যাইত; যথা,—

মূল ধাতু ed (= সংস্কৃত 'অদ্') —প্রকৃতিগত বা গুণগত পরিবর্ত্তনে হইল od; তদনন্তর এই দুইটী হ্রস্ব রূপ, মূল-রূপে গৃহীত ed ও তদ্‌বিকারজাত od, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ ēd, ōd; এবং স্বরাঘাতের একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র -d রূপ লইয়া দাঁড়াইল; ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই,—

ed od ēd ōd d

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের e, o, a, এই তিনটী হ্রস্ব ধ্বনি সংস্কৃতে একটী মাত্র রূপ a বা অ-কারে পর্য্যবসিত হয়, এবং তদ্রূপ ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ ē ō ā-ও সংস্কৃতে মাত্র দীর্ঘ ā বা আ-কারে পর্য্যবসিত হয় ; সুতরাং—

হ্রস্ব ed-, od-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ad='অদ্', ও দীর্ঘ ēd-, ōd- এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ād='আদ্' ; এইরূপে 'অদ্' ধাতুর ফল হইল, 'অদ্-' (গুণ), 'আদ্-' (বৃদ্ধি) ও '-দ্-' ; যথা—

'অদ্-তি=অত্তি' ; 'অদ্-অন-ম্=অদনম্' ; 'অদ্-ন- =অন্ন' ; 'আদ' (লিট্) ; 'অদ্' > '-দ্'+'-অন্ত্' (শতৃ)='দন্ত' (যাহা খাদন ক্রিয়া করে) ।

গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ—এক সূত্রে এই তিনটীকে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তনের সমস্ত ব্যাপারটী সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূলরূপে থাকে, এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘীকরণ হয় না, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে আমরা 'গুণ' পাই ; আর যেখানে ইহার নিজ মূল প্রকৃতির বা পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে পাই 'বৃদ্ধি' ; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে 'য র ল ব' (অর্থাৎ 'ই+অ, ঋ+অ, ৯+অ, উ+অ') স্থলে যেখানে 'য্ র্ ল্ ব' বা 'ই, ঋ, ৯, উ' পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিবর্ত্তনকে বলে 'সম্প্রসারণ'। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে, ইহাই হইল গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা।

সমগ্র ব্যাপারটীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া, গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এইরূপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া, একটী ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ জরমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮১৯ সালে জরমান ভাষাতত্ত্ববিৎ Jakob Grimm যাকোব গ্রিম জরমান ভাষার প্রথম আধুনিক ভাষাতত্ত্বানুসারী ব্যাকরণ লেখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্ত্তনের নাম করিবার জন্য জরমান ভাষায় (এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Umlaut শব্দের অনুরূপ) একটী শব্দ সৃষ্টি করেন—সে শব্দটী হইতেছে Ablaut; উপসর্গ ab-এর সঙ্গে পূর্ব্ব-বর্ণিত Laut শব্দের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে off, ও সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অপ'। সম্পূর্ণ শব্দটীর সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অপশ্রুত'; কিন্তু Umlaut-এর প্রতিরূপ-হিসাবে যেমন 'অভিশ্রুত' না ধরিয়া 'অভিশ্রুতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রূপ এখানেও অপশ্রুত না বলিয়া অপশ্রুতিই গ্রহণ করিতে চাই। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির—মূল শ্রুতির—অপ-গমন বা বিকার,—ইহাই হইবে 'অপশ্রুতি'র ধাতুগত অর্থ। প্রাকৃত ব্যাকরণের 'য়-শ্রুতি,' তদবলম্বনে প্রযুক্ত 'ব-শ্রুতি,' এবং নব-সৃষ্ট 'অভিশ্রুতি'র পার্শ্বে এই 'অপশ্রুতি' শব্দ ধ্বনি বা উচ্চারণ-গত পরিবর্ত্তনের সংজ্ঞা-হিসাবে সহজ ভাবেই এক পর্য্যায়ের হইয়া দাঁড়াইবে। Ablaut বা অপশ্রুতির অন্য কয়েকটী নাম যাহা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে ইংরেজী Vowel-Alternance, বা স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিবর্ত্তন, ফরাসীতে alternances vocaliques; কিন্তু ইংরেজীতে Ablaut শব্দটীও

বহুশঃ গৃহীত হইয়া গিয়াছে; এবং এতদ্ভিন্ন, Ablaut-এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া একটী শব্দ ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যবহার করিতেছেন; বিশেষতঃ ফরাসীরা, যাঁহারা জরমান Ablaut শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ alternance vocalique অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন; ab-এর গ্রীক প্রতিরূপ apo, এবং Laut-এর গ্রীক প্রতিশব্দ phōnē, এই দুই মিলাইয়া, গ্রীক apophōneia, তাহা হইতে লাতীন apophonia শব্দ কল্পনা করিয়া, এই apophonia শব্দকে ইংরেজীতে Apophony এবং ফরাসীতে Apophonie রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ 'অপশ্রুতি'-দ্বারায় বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা করা যায়। 'চল—চাল', 'টুট—তোড়', 'দিশা—দেশ', 'পড়—পাড়', প্রাচীন বাঙ্গালার 'বিদু (=বিদুৎ)—বেজ (=বৈদ্য)'—এই প্রকারের স্বরবৈচিত্র্যকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 'অপশ্রুতি'-র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বরধ্বনি-ঘটিত অন্য যে সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তাহাদের নাম বিদ্যমান আছে;—যথা লোপ ও আগম (আদ্য, মধ্য, অন্ত্য), এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (anaptyxis)। এগুলি লইয়া আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত **স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি** ও **অপিশ্রুতি** ভাষায় চলিতে পারিবে কি না, সুধীবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৩১ সালের লোকগণনা-অনুসারে পাঁচ কোটির অধিক সংখ্যক লোকে বাঙ্গালা বলে। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র বাঙ্গালা ভাষা চলে, তদতিরিক্ত বিহারের সাঁওতাল-পরগনায়, মানভূমে ও পূর্ণিয়া জেলায়, এবং আসামের গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশেও অল্প-স্বল্প বাঙ্গালা-ভাষী আছে। লোকসংখ্যা-হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাকে পৃথিবীর সাত আটটী প্রধান ভাষার মধ্যে একটী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইংরেজী, উত্তরের চীনা, রুষ, জরমান, স্পেনীয়, জাপানী—এগুলির পরেই বাঙ্গালার স্থান। আমাদের দেশে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষারই প্রসার এবং প্রভাব খুব বেশী,—প্রায় তের কোটি লোকে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুস্থানী যাহারা কেবলমাত্র বাহিরের ভাষা বা পোষাকী ভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া, ঘরেও মাতৃভাষারূপে বলিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা বঙ্গভাষীদের চেয়ে ঢের কম।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষারও নানা রূপ আছে। যে সব ভাষায় বহুদিন ধরিয়া লিখিত সাহিত্য বিদ্যমান, প্রায় দেখা যায় যে, সে সব ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও সাধারণ কথোপকথনের রূপের মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক- ও কথ্য-ভেদে বাঙ্গালা ভাষারও বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথম—বাঙ্গালার সাহিত্যিক রূপ—বা 'সাধুভাষা'; সাধারণতঃ এই সাধুভাষায় সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্যসাহিত্য চিঠিপত্রাদি লিখিত

হইয়া থাকে। সাধুভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌখিক বাঙ্গালা বিদ্যমান। এইগুলির মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের এবং ভাগীরথী নদীর দুই তীরের ভদ্রসমাজের লোকেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণতঃ সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে; বিভিন্ন স্থানের লোকে একত্র কথাবার্ত্তায় সকলেই কলিকাতা-অঞ্চলের এই ভাষা বলেন, বা বলিতে চেষ্টা করেন; এই বিশিষ্ট মৌখিক ভাষাকে 'চলিত ভাষা' বলা হয়। 'সাধু-ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'-কে ইংরেজীতে যথাক্রমে Standard Literary Bengali (অথবা High Bengali) এবং Standard Colloquial Bengali রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। সাধুভাষার ন্যায় চলিত ভাষাও আজকাল সাহিত্যে খুব ব্যবহৃত হইতেছে,— সাধুভাষার পার্শ্বে গদ্যসাহিত্যেও ইহার একটা স্থান হইয়াছে। পদ্যসাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ চলিত ভাষা, অথবা মিশ্র সাধু ও চলিত ভাষারই প্রচলন বেশী।

নিম্নে বিভিন্ন কয়েক প্রকারের বাঙ্গালার নিদর্শন দেওয়া হইল :—

[১] সাধুভাষা—তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল। সে যখন আসিয়া বাটীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখনই নৃত্যগীতবাদ্যাদির ধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহাতে সে একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই সকল ব্যাপারের অর্থ কি? ভৃত্য উত্তর দিল—আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, ও আপনার পিতা তাঁহাকে নিরাপদে সুস্থশরীরে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন।

[২] চলিত ভাষা (কলিকাতা, ভাগীরথী-তীর)—তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাড়ীর

কাছে যেম্‌নি পৌঁছুলো, ওম্‌নি নাচ গান বাজনার শব্দ শুন্‌তে পেলে। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেসা ক'র্‌লে—এসব ব্যাপার হ'চ্ছে কেন? তাতে চাকর ব'ল্‌লে—আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাঁকে ভালোয়-ভালোয় ফিরে পেয়েছেন ব'লে নাচ-গান খাওয়ান-দাওয়ান ক'র্‌ছেন।

[৩] **মানভুমের মৌখিক ভাষা** (পশ্চিম বঙ্গ)—ঐ লোকটার বড়ো বেটা তেখ্‌নে ক্ষেতে গেল্‌ছিলো, সে ফির্‌ত্তি সময়ে যখ্‌নে আপনাদের ঘরের পাশ হাবড়াল, তখ্‌নে নাচ-বাজ্‌নার ধুম শুন্‌তে পাই্‌ একজন মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্‌ যে এসব কিসের লিয়ে হচ্চে রে? মুনিশটা ব'ল্‌লেক—তুমার ভাই আইছেন্‌ ন, এহাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াছেন, কেন্‌ন উহাকে ভালায়-ভালায় পাওয়া গেল্‌ছে।

[৪] **রাজবংশী** (উত্তর বঙ্গ)—তখন তার বড় বেটা পাতার বাড়ীৎ আছিল্‌। পাছোৎ তাঁর আস্‌তে আস্‌তে বাড়ীর কাছোৎ যায়া নাচ-গানের শোর শুনবার পাইল্‌। তখন তাঁর একজন চেঙ্গরাক্‌ ডাকেয়া পুছ করিল্‌—ইগ্‌লা কি? তখন তাঁর তাক্‌ কৈল্‌—তোর ভাই আইচে, তোর বাপ্‌ তাক্‌ ভালে ভালে পায়্যা একটা বড় ভাওরা ক'র্‌চে।

[৫] **ঢাকা, মাণিকগঞ্জ** (পূর্ব্ব বঙ্গ)—তার বর' ছাওয়াল তখন মাঠে আছিলো। সে বারীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্‌লো ততই বাজনা আর নাচ শুইন্‌বার লাইগ্‌লো। তারপর একজন চাকরেরে ডাইকা জিগ্‌গাসা কৈল্লো—ইয়ার মানে কি? সে কৈলো—তোমার ব'াই আইচে, তারে ব'ালে-আলে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওয়া দিচেন।

[৬] **শ্রীহট্ট**—তখন তার বড় পুয়া ক্ষেতে ছিল। সে বাড়ীর নিকট আইলে নাচ গাওনার শব্দ হুন্‌ল। সে একজন চাকরের ডাকিয়া জিগাইল্‌—এ হকল কিয়র? সে তাহারে কহিল্‌—তুমার ব'াই বাড়ীৎ আইছে, তাতে তুমার বাপ বড় খানি দিছন, কেননা তারে সুস্থ অবস্থায় পাইছন।

[৭] **চট্টগ্রাম**—তার বড় পোয়া বিলৎ আছিল্‌। তে যখন ঘরর কাছে আইল্‌, তান্‌ নাচন্‌ বাজন্‌ হুনিল'। তে তার একজন গাউন্যরে ডাই

জিজ্ঞাইল যে কি হইয়ে? তে তারে কইল—আঁওনার ব'াই আস্তে, আঁওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে এক নির্মন্ত্রণ দিয়ে।

[৮] বরিশালে—হে কালে হের বড় পোলা কোলায় আছিল। হে বাড়ীর কাছে যাইয়া বাজনা নাচনা হুনিতে পাইয়া একজন চাহর ডাকিয়া জিগাইল যে এরা কি? সে কৈল—তোমার ব'াই আইছে আর তোমার বাপ মস্ত খানা যোগার হর্‌ছে, কারণ ছোট পোলা ব'াল বা'লাইতে পাইছে।

বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র হওয়ায় এবং সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড় শত বৎসরের অধিক-কাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন, বিগত তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ-ও বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যিক বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম বঙ্গের এই অঞ্চলের একটা প্রাধান্য সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সর্ব্ব বিষয়ে এই প্রাধান্যের অধিকারী। কলিকাতা-নিবাসী এবং কলিকাতা-প্রবাসী বহু বাঙ্গালী লেখক কলিকাতার সর্ব্বজন-আদৃত এই চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে, সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা—বাঙ্গালা ভাষার এই উভয় রূপই আলোচ্য। চলিত ভাষার নিজের নানা বৈশিষ্ট্য, নানা নিয়ম আছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধুভাষারই আলোচনা থাকে, চলিত ভাষা-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে না। চলিত ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ আমরা হয় জন্মগত অধিকারে শিশুকাল হইতেই শিখিয়া থাকি, নয় ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষিত লোকের কথাবার্ত্তায় এবং সাহিত্যে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া ইহার রীতিনীতি আয়ত্ত করিয়া লই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা তথা আধুনিক সাধুভাষা হইতে, চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা ভাষার একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা বলি 'রেখে, রেখেঁ, রেখ্যা, রাখেঁ, রাইখ্যা' প্রভৃতি; অধুনিক সাধুভাষার রূপ 'রাখিয়া' (এই পূর্ণ রূপ কোনও কোনও মৌখিক ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ 'রাখিঞা, রাখিয়া, রাখি'—এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌখিক রূপগুলির মূল;—পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক কথিত রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, লোকে তখন 'রাখি, রাখিয়া' বা 'রাখিঞা' বলিত।

আধুনিক সাধু ভাষায় দুইটী বিষয় লক্ষণীয়—ইহার ক্রিয়া সর্ব্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপ-সমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং উহাদের মূলস্থানীয়; এবং সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মুখ্যতঃ পশ্চিম বঙ্গের ভাষার আধারের উপরে পুরাতন বাঙ্গালার সর্ব্বজন-গ্রাহ্য একটী সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়া যায়। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার

ধারাটীকে অনেকটা অবিকৃত রাখিয়াই আধুনিক সাধুভাষার উদ্ভব। প্রাচীন রূপটী বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও সর্ব্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধুভাষায় অপরিবর্ত্তিত আছে। কেবল মাত্র গত এক শত পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইল, সাধুভাষায় বা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০০০ হইতে এখন পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন আমরা পাইতেছি। প্রাচীন পুঁথিতে ও প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্যের গ্রন্থে সে কালের ভাষা পাওয়া যায়। এই ভাষা আধুনিক সাধুভাষা হইতে বেশী পৃথক্ নহে। পার্থক্য যাহা কিছু, তাহা প্রধানতঃ শব্দ লইয়া। প্রাচীন ভাষার বহু শব্দ আজকাল লোপ পাইয়াছে, বা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং আধুনিক ভাষায় আমরা বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ বা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করি। এখন হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল (পাঠকালে শব্দগুলিকে উড়িয়ার মত স্বরান্ত করিয়া পড়িতে হইবে)—

কে না বাঁশী বাএ (=বাজায়) বড়ায়ি, কালিনী নই-
(=কালিন্দী নদী, যমুনা) কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ (=গোষ্ঠ) গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ (হঞা=হইয়া) তার পাএ নিশিবোঁ আপনা (=নিজেকে
নিক্ষেপ করিব)॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে (=আমি কি দোষ করিলাম)॥

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতেঁ কি বা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখী নহোঁ তার ঠাই (=ঠাঁই) উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ (=ওগো) বড়ায়ি, জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন (=যেন) কুম্ভারের পণী (=পন) ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন (=কানু, কৃষ্ণ) আভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

[চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বংশীখণ্ড]

মহাকবি চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন—চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদের গান নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ শুনিতেন ও গাহিতেন। কিন্তু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের কত পূর্ব্বে ছিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখ ১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের ব্যক্তি বলিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে পারি। অন্ততঃ এই টুকু আমরা বলিতে পারি যে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পূর্ব্বেকার সময়ের বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শন একেবারে মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের—খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র পূর্ব্বেকার। তখন বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী তুর্কীরা বাঙ্গালাদেশের অংশবিশেষ জয় করে,

ও বাঙ্গালাদেশে মুসলমান ধর্ম্ম ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তুর্কীদের আসিবার পূর্ব্বে পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশে সব বিষয়ে একটা উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-ভাষায় কবিতা ও গান লেখাও হইত। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের নানা শাখা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল ছিল, দেশের বহু লোকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনা মানিত। সহজিয়া শাখার বৌদ্ধদের আচার্য্যেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধনা-সম্পর্কিত যে সব গান দেশ-ভাষায় রচিতেন, সেইরূপ কতকগুলি বাঙ্গালা গান বাঙ্গালার বাহিরে নেপালে প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালায় একখানি প্রাচীন পুঁথিতে এইরূপ সাতচল্লিশটী গান পাইয়া, অন্য তিনখানি পুঁথির সহিত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই গানগুলিকে ছাপাইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত করেন। গানের বিষয়-বস্তু হইতেছে সহজিয়া বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গের সাধনের গূঢ় কথা। গানগুলিকে 'চর্য্যা' বা 'চর্য্যাপদ' বলা হয়। পুঁথিতে গান কয়টীর ভাষা বিশেষভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এই গান কয়টীর মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদের নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল (প্রাচীন পুঁথির বানান একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে)—

"রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাই।"	(গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়)
"আইল গরাহক অপণে বহিয়া।"	(গ্রাহক আপনিই [পথ] বহিয়া আসিল)
"ভবনই গহণ গম্ভীরবেগেঁ বাহী।	(ভবনদী গহন, গম্ভীর বেগে প্রবাহিত)
দু আন্তে চীখিল, মাঝে ন থাহী॥	(দু ধারে কাদা, মাঝে থাই বা থই নাই)

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই। (ধর্ম্ম-হেতু [সিদ্ধাচার্য্য] চাটিল সাঁকো গড়ে)
পারগামী লোঅ নীভর তরই॥" (পারগামী লোকে নির্ভর তরে)
"নগর-বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরী কুড়িআ।
(ওরে ডোমনী, নগর-বাহিরে তোর কুঁড়ে')
ছোই ছোই জাইসি বাহ্মণা নাড়িআ॥ (নেড়া বামুনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাইস্)……
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবেঁ। (ওলো ডোমনী, তোকে সদ্ভাবে পুছি)
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরী নাবেঁ॥"
(ওরে ডোমনী, কার নায়ে আসিস্ যাইস্)

উপরের নিদর্শন-মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের রচিত পদগুলি এখন হইতে মোটামুটী হাজার বছর পূর্ব্বেকার লেখা—খ্রীষ্টীয় ৯৫০ হইতে ১২০০-র মধ্যে। এগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা। এই প্রাচীন বাঙ্গালায় পশ্চিমা অপভ্রংশের কিছু কিছু রূপ আসিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই প্রাচীন ভাষা সহজে বুঝিতে পারিবে না।

এই প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্ব্বেকার সময়ের এদেশের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টীয় ৭০০ কি ৮০০, কি ৬০০-তে বঙ্গদেশের লোকেরা যে ভাষা বলিত, তাহাকে বাঙ্গালার পূর্ব্ব রূপ বলা যায়। এই পূর্ব্ব রূপ 'প্রাকৃত' পর্য্যায়ে বা মধ্য অবস্থার আর্য্য ভাষার পর্য্যায়ে পড়ে, ইহাকে আর বাঙ্গালা অর্থাৎ আধুনিক আর্য্য ভাষার পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির আলোচনার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাকৃত কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার আলোচনা।

অতি প্রাচীন কালে, এখন হইতে চারি হাজার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এদেশে অনার্য্য জাতির লোকেরা বাস করিত।

ইহারা মুখ্যতর কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল—ইহাদের ভাষা আর্য্যভাষা সংস্কৃত হইতে একেবারে পৃথক্‌। পরে পশ্চিম হইতে ইরান বা পারস্য দেশ হইয়া আর্য্যজাতির লোক কিছু কিছু ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং দেশের অনার্য্যদের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়। এই ব্যাপার কবে ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে অধুনা-লব্ধ অনেকগুলি বস্তু ও তথ্য হইতে অনুমান হয় যে আর্য্যদের ভারতে আগমন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্দ্ধে ঘটিয়াছিল (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ-তে)। নিজ ভাষা লইয়া আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে, উত্তর কালে এদেশে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। আর্য্যজাতির ভাষা ভারতে আসিয়া প্রথমটা যে রূপ ধারণ করে, সে রূপ আমরা ঋগ্‌বেদে পাই। ঋগ্‌বেদ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ; এবং জগতের তাবৎ প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদকেও ধরিতে হয়। ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি চারি বেদ ও তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে আমরা এখন 'বৈদিক সংস্কৃত' বা 'বৈদিক' বলি; প্রাচীন কালে ইহার আর একটী নাম ছিল—'ছন্দস্‌' বা 'ছন্দঃ' অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্য্যভাষার রূপ বৈদিক ভাষা অনেকটা রক্ষা করিয়া আছে। আদি আর্য্যজাতির মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা কর্ত্তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আদি-আর্য্য-ভাষা' একদিকে যেমন বৈদিকের জননী, এবং বৈদিক ভাষা হইতে বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী মারহাট্টী সিন্ধী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্যভাষাগুলি

উদ্ভূত বলিয়া যেমন এগুলিরও মূলস্বরূপ, তদ্রূপ অন্য দিকে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলা হয়—যথা ফারসী, আর্মানী, গ্রীক, আল্‌বানীয়, বুল্‌গার, যুগোশ্লাব, চেখ, পোল, রুষ, লেট্‌, লিথুআনীয়, সুইডিশ, নরউইজীয়, ডেনীয়, জরমান, ডচ্‌, ইংরেজী, আইরীশ, ওয়েল্‌শ্‌, ব্রেতন, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্ত্তুগীস প্রভৃতি, সেগুলিরও আদি-জননী। এই সমস্ত ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির সহিত সংস্কৃতের (বা বৈদিকের) বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়—এক অধুনা-লুপ্ত আদি আর্য্যভাষার বিকারে এইগুলি উৎপন্ন। প্রাচীন আর্য্যভাষা, যথা বৈদিক, অবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন আর্মানী, প্রাচীন গ্রীক, লাতীন, গথিক, প্রাচীন শ্লাব, তোখারীয় প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই লুপ্ত আদি আর্য্যভাষার ধ্বনি, শব্দ ও প্রত্যয়াদি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই লুপ্ত ভাষার সম্ভাব্য রূপটী ধরিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা—এই দুইটী ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠীর বলিয়া পরস্পর-সংযুক্ত; দুইয়ের মধ্যে ধ্বনি ও রূপে এখন বিস্তর প্রভেদ, কিন্তু আধুনিক ইংরেজীর প্রাচীন রূপ Old English বা Anglo-Saxon ও আধুনিক বাঙ্গালারও প্রাচীনতম রূপ অর্থাৎ বৈদিক মিলাইয়া দেখিলে এই দুই ভাষার মৌলিক সাদৃশ্য বুঝা যাইবে। কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী বিশদ করা যাইতেছে—

[১] বাঙ্গালা 'চাক্‌' cāk শব্দ < প্রাচীন বাঙ্গালা 'চাক' cāka < প্রাকৃত 'চক্ক' cakka < বৈদিক বা সংস্কৃত 'চক্রঃ, চক্রস্‌' cakraḥ, cakras : গ্রীকে kuklos কুক্লোস্‌ : আদি আর্য্য সম্ভাব্য রূপ *qʷeqʷlos * 'কেক্‌লোস্‌'। এই আদি আর্য্য রূপ ইংরেজী

ভাষায় এই রীতি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—*q^{w}eq^{w}los > *x^{w}ex^{w}laz > hwegul > hwēol > wheel (hwīl). 'চাক' ও wheel সমার্থক ও সম-মূল শব্দ, কিন্তু এখন ইহাদের রূপে কত পার্থক্য; কিন্তু আদি আর্য্যভাষার মূল রূপে নিজ নিজ মাতৃস্থানীয় ভাষার মধ্য দিয়া ইহাদের সমাধান হয়।

[২] আদি আর্য্যভাষায় *dn̥t—dent—dont : ইহা হইতে একদিকে বৈদিক ভাষায় 'দন্ত, দৎ-' শব্দের উদ্ভব, আবার গ্রীক odont-, লাতীন dens—dentis শব্দের উদ্ভব, এবং অন্য দিকে প্রাচীনতম ইংরেজীতে *tanth, পরে *tonth, tōth ও আধুনিক ইংরেজী tooth. 'দন্ত' danta হইতে বাঙ্গালা হিন্দী 'দাঁত' dãt শব্দ; 'দাঁত' ও tooth সমানার্থক ও সম-মূল শব্দ।

[৩] বাঙ্গালা 'মা' mā < প্রাচীন বাঙ্গালা 'মাঅ' māa < প্রাকৃত 'মাআ, মাদা, মাতা' māā, mādā, mātā < বৈদিক 'মাতা'—'মাতৃ বা মাতর্' শব্দ < আদি আর্য্যরূপ *mātēr, ইহা হইতে গ্রীক mētēr, লাতীন mater, প্রাচীন ইংরেজী mōder, এখনকার ইংরেজী mother।

এইরূপে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির প্রাচীন রূপ আলোচনা করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত, প্রাচীন-পারসীক, গ্রীক, লাতীন, গথিক্, প্রাচীন-ইংরেজী, প্রাচীন-স্লাব, প্রাচীন-আইরীশ প্রভৃতি প্রাচীন-আর্য্যভাষাগুলি যে একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহা দুইটী বিষয় হইতে বুঝা যায়: (১) ইহাদের শব্দবিন্যাস ও বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি এক প্রকারের; এবং (২) ইহাদের মধ্যে ভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ ধাতু ও শব্দ এবং প্রত্যয় ও বিভক্তি এক। বহুদূর দেশে ও

কালে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ একাধিক ভাষার জ্ঞাতিত্ব, ব্যাকরণ-রীতি ও ধাতু এই দুইটী বিষয়ের সাদৃশ্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃত (এবং সংস্কৃতের আধুনিক রূপ বাঙ্গালা) ও ইংরেজী, সংস্কৃত ও গ্রীক প্রভৃতি এক গোষ্ঠীর ভাষা; কিন্তু আরবী, তুর্কী, চীনা, তামিল, সাঁওতাল—এই ভাষাগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর, সংস্কৃত গ্রীক ইংরেজী প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোনও মৌলিক সম্পর্ক নাই।

নিম্নে প্রদত্ত বংশ-পীঠিকা-চিত্র হইতে আর্য্যভাষা-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংযোগ স্পষ্টীকৃত হইবে। বৃক্ষের আকারে চিত্রদ্বারাও এই বংশ-পরিচয় প্রদর্শিত হইল। পীঠিকা-চিত্র হইতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা যাইবে।
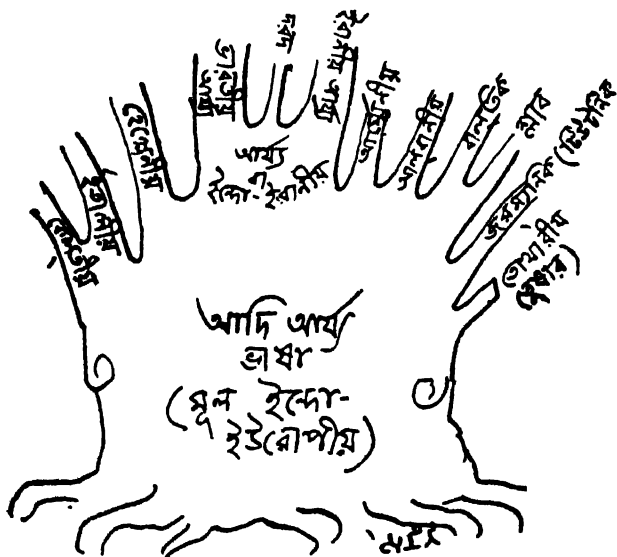
[১] বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞাতি-স্থানীয় ভাষা
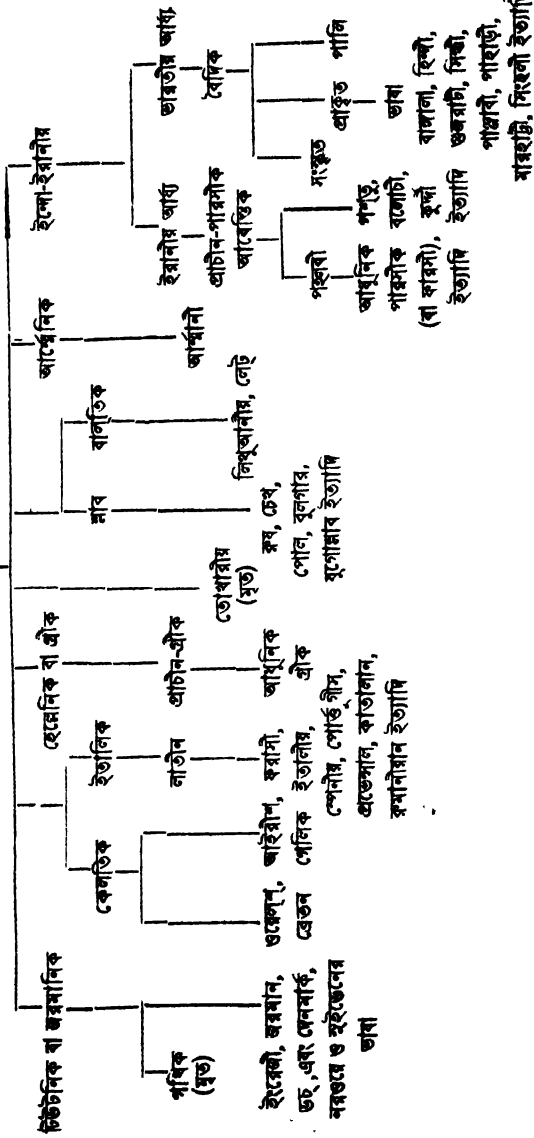
[২] বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ

[ক] Austric 'অস্ট্রিক' বা 'দক্ষিণ-দেশীয়' ভাষা-গোষ্ঠী

- দক্ষিণ-দ্বীপের শাখা (অস্ট্রোনেসিয়ান) Austronesian
  - পলিনেসিয়ান Polynesian
  - মেলানেসিয়ান Melanesian
  - ইন্দোনেসিয়ান Indonesian
    - মালাই, সুন্দা, যবদ্বীপীয়, মদুরী, বলিদ্বীপীয় প্রভৃতি
- দক্ষিণ আসিয়ার শাখা (অস্ট্রো-এশিয়াটিক) Austro-Asiatic
  - (১) মোন্-খ্মের্ Mon-Khmer ও অন্যান্য সম্পৃক্ত ভাষা
  - (২) নিকোবারী
  - (২) খাসিয়া
  - (৪) কোল Kol (অথবা মুণ্ডা Munda)
    - সাঁওতাল, হো, মুণ্ডারী, কুরকু, শবর, গদব ইত্যাদি
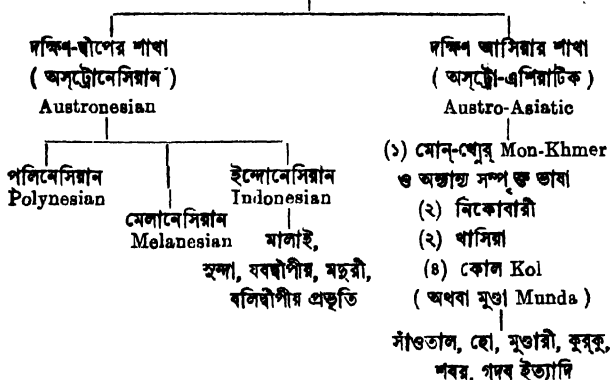
[খ] Dravidian দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠী
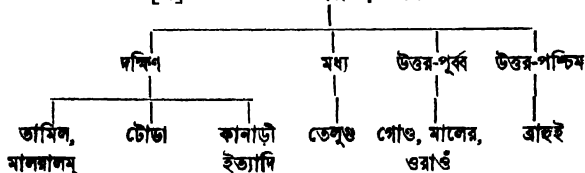
[গ] Tibeto-Chinese ভোট-চীন ভাষা-গোষ্ঠী

[ঘ] Indo-Iranian বা Aryan আর্য্যভাষা-গোষ্ঠী

আদি-ভারতীয়-আর্য্য
(বৈদিক)
মধ্য-ভারতীয়-আর্য্য
(প্রাকৃত)
নব্য-ভারতীয়-আর্য্য
(ভাষা)
বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া, মগহী-মৈথিল-ভোজপুরিয়া, পূর্ব্বী-হিন্দী (অবধী ইত্যাদি), পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাখা, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি), পূর্ব্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাহাড়ী, রাজস্থানী-গুজরাটী, মারহাট্টী-কোঙ্কণী, সিংহলী, ইউরোপের জিপ্‌সী (হাঘরে'দের ভাষা)

আদি-ইরানীয়-আর্য্য
(আবেস্তিক, প্রাচীন-পারসীক)
মধ্য-ইরানীয়-আর্য্য
(পহ্লবী, প্রাচীন-খোতানী, প্রাচীন-স্গ্‌দ ভাষা)
নব্য-ইরানীয়-আর্য্য
(ফারসী, কুর্দ্দী, পশ্‌তু, বলোচী, ওস্‌সেতী Ossetic ইত্যাদি)
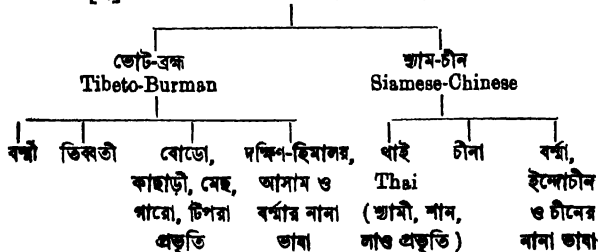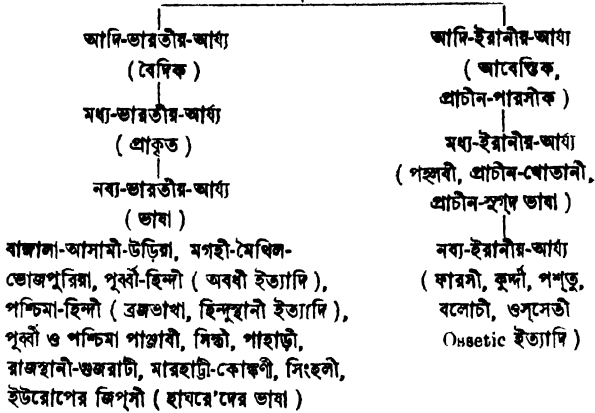
আদিম আর্য্যভাষা ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসে—অনুমান হয়, এশিয়া-মাইনরের পূর্ব্ব প্রান্ত ও উত্তর মেসোপোতামিয়ার পথ দিয়া, পারস্য ও আফগানিস্থান হইয়া আসে। উত্তর-ভারতে আর্য্য জাতির ও আর্য্য ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে আর্য্যভাষারও প্রসার ঘটে। বহু স্থলে অনার্য্যগণ বিজেতা আর্য্যের ভাষা গ্রহণ করিল; আবার অনার্য্য ও আর্য্য উভয় জাতি মিলিয়া যে নবীন সভ্যতার সৃষ্টি করিল, যাহা উত্তরকালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত হইল, সেই সভ্যতার বাহন হইল আর্য্যের ভাষা; হিন্দুসভ্যতার ভাষা বলিয়াও বহুশঃ আর্য্যভাষা-প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৮০০-র মধ্যে এই আর্য্যভাষা উত্তরাপথে পাঞ্জাব হইতে উত্তর-বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এতটা দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ায়, এবং ভাষার পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মের নিয়ম-অনুসারে, এই আর্য্যভাষা

আর অবিকৃত থাকিতে পারিতেছিল না, বদলাইয়া যাইতেছিল; এতদ্ভিন্ন ভারতীয় আর্য্যভাষী জনগণও আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া ইহাতে অনার্য্য ধ্বনি ও ব্যাকরণ-রীতি এবং অনার্য্য শব্দসম্ভার আনয়ন করিতেছিল, ও ইহার রূপ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছিল। এই সব কারণে, আর্য্যভাষা আর্য্য আগন্তুকদের মুখে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা আর বজায় রহিল না,—খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরিল। ফলে, 'আদি ভারতীয়-আর্য্য' বা বৈদিক ভাষা—'মধ্য ভারতীয়-আর্য্য' অবস্থায়, 'প্রাকৃত' ভাষায় রূপান্তরিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করিত—ভাষায় নানা সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছিল; মধ্য যুগের ভাষায়—প্রাকৃতে—সেগুলিকে সরল করিয়া লওয়া হইল। দুই বা তদধিক বিভিন্ন ব্যঞ্জন মিলিয়া দ্বিত্ব বা দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত একটী ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যেমন 'ধর্‌ম বা ধর্ম্ম' স্থলে 'ধম্‌ম বা ধম্ম', 'ভক্ত' স্থলে 'ভত্ত', 'অষ্ট' স্থলে 'অট্‌ঠ' ইত্যাদি। সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিদ্বয়ের একটী একটী আবার আর একটীর প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিল; যথা 'সত্য' স্থলে 'সচ্চ' (দন্ত্য-বর্ণ ত-কারের তালব্য চ-য়ে পরিবর্ত্তন), 'প্রশ্ন' স্থলে 'পণ্‌হ', 'ভর্ত্তা' স্থলে 'ভট্টা' ইত্যাদি। এইপ্রকারের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্ত্তন ভারতের আর্য্যভাষার দ্বিতীয় যুগের বা প্রাকৃতের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইল প্রাকৃত। প্রাকৃত আবার প্রদেশ-ভেদে নানা প্রকারের হইত। প্রাকৃতের উদ্ভব হয় বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০-৬০০-র দিকে। এই সুপ্রাচীন কালে মুখ্যতঃ তিন প্রকারের প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়।

এক—'উদীচ্য' প্রাকৃত, পশ্চিম- ও উত্তর-পাঞ্জাব অঞ্চলে, গান্ধার কেকয় মদ্র প্রভৃতি জনপদে বলা হইত ; দুই—'মধ্যদেশীয়' প্রাকৃত, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদির পশ্চিমখণ্ডে কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলে বলা হইত ; ও তিন—'প্রাচ্য' প্রাকৃত, প্রয়াগ অযোধ্যা কাশী অঞ্চলে বলা হইত, এবং এই প্রাচ্য প্রাকৃত পরে বিদেহ বা উত্তর-বিহার প্রদেশে এবং মগধ বা দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে প্রসৃত হয়, ও বিহার প্রদেশে দুই একটী নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এত প্রাচীন কালে অন্য প্রাকৃতের খবর আমরা পাই না, তবে সম্ভবতঃ অন্য প্রকারের ওপ্রাকৃত ছিল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতও বদলাইতে থাকে। 'উদীচ্য', 'মধ্যদেশীয়', 'প্রাচ্য'—এই তিন মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত ভাঙ্গিয়া ক্রমে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে 'শৌরসেনী' ও 'মহারাষ্ট্রী', 'অর্দ্ধমাগধী', 'মাগধী', 'আবন্তী', 'দাক্ষিণাত্যা' প্রভৃতি নানা পরবর্ত্তী কালের প্রাদেশিক প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। এগুলির সাহিত্যিক রূপও দেখা দিল। এই সকল প্রাদেশিক প্রাকৃত আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া আজকালকার ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যভাষার নবীন রূপ ধারণ করে। এই ব্যাপার খ্রীষ্টাব্দ ৫০০-র পরে ও ১০০০-এর মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য্যভাষার মাঝামাঝি অবস্থাকে 'অপভ্রংশ' অবস্থা বলা হয়।

সংস্কৃত অথবা বৈদিক ; প্রাকৃত—খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব যুগের প্রাচীন প্রাকৃত, ও খ্রীষ্ট-পর যুগের প্রাকৃত ; তৎপরে অপভ্রংশ ; এবং তাহার পরিবর্ত্তনে আধুনিক ভাষা ;—ইহাই হইতেছে বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, অবধী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারহাট্টী, নেপালী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্যভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের ধারা।

নিম্নে প্রদত্ত কতকগুলি উদাহরণ হইতে এই ধারাটী বুঝা যাইবে। এই সকল পরিবর্ত্তন বিশেষ কতকগুলি নিয়ম ধরিয়া ঘটিয়াছিল—অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বা খামখেয়ালী রূপে হয় নাই—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সংস্কৃত	প্রাচীন-প্রাকৃত	পরবর্ত্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
অদ্য (*অদ্যম্)	অজ্জ, অজ্জিং	অজ্জিং	অজ্জিঁ	আজি	আইজ্, আ'জ্, আজ্
অধস্তাৎ, *অধিস্তাৎ	*অধিট্ঠা, অহেট্ঠা	হেট্ঠা, হেণ্টা	হেণ্ট	হেণ্ট	হেঁট্
অপর	অপর	অবর	অবর	আঅর	আর্
অলক্ত	অলত্ত	অলত্ত	অলত্ত	আলতা	আল্তা
অবিধবা	অবিধবা	অবিহবা	অইহব	আইহঅ, আইহ, আয়া	এয়ো
অশীতি	অসীতি	অসীদি, অসীই	অসীই	আসী	আশী
অষ্টাদশ	অট্ঠাদস, *অট্ঠাডহ	অট্ঠারহ	অট্ঠারহ	আঠারহ	আঠারো
অস্মে	অম্হে	অম্হে	অম্হি	আম্হি	আমি, -আম্
আদিত্য	আদিচ্চ	আইচ্চ	আইচ	আইচ	আইচ্ (পদবী)

সংস্কৃত	প্রাচীন-প্রাকৃত	পরবর্ত্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
আম্রাতক	* অম্বাদক, অম্বাডক	অম্বাডঅ	অম্বাডঅ	অম্বাডা	আমড়া
ইন্দাগার	ইন্দাগার	ইন্দাআর	ইন্দার	ইন্দারা	ইঁদারা, ইঁদেরা
কথয়তি	কথেতি, কধেদি	কহেই	কহেই, কহই	কহই	কহে, কয়
কর্ণ	কণ্ণ	কণ্ণ	কণ্ণ	কান	কান্
কর্ষপট্টিকা	কস্সপট্টিকা	কস্সবট্টিঅ	কস্সবট্টিঅ	কসঅটী	কষটী, কষ্টী
কীদৃশ, কীদৃশন, *কাদৃশন	*কাদিসণ	*কাইসণ, কইসণ	কইহণ	কৈহণ, কেহেন, কেহু	কেন
কৃষ্ণ, *ক্রষ্ণ	*কহ্ণ, কণ্হ	কণ্হ	কণ্হ	কান্হ	কান, কানু, কানাই
কেতক	কেতক	কেদগ, কেঅঅ	কেঅঅ	কেআ	কেয়া
* কেতক-ট	কেতকট	কেদগড, কেঅঅড	কেঅঅড	কেয়ডা	কেওড়া
খাদতি	খাদতি, খাদদি	খাঅই	খাই	খাই	খায়

সংস্কৃত	প্রাচীন-প্রাকৃত	পরবর্ত্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
গত+ইল	গত, গদ+ইল্ল	গঅ-ইল্ল	গইল্ল	গৈল, গেল	গেল
গর্দ্দভ	গদ্দভ	গদ্দহ	গদ্দহ	গাদহ	গাধা
গৃহিণী	ঘরিণী	ঘরিণী	ঘরিণী	ঘরিণী	ঘরণী
গোমিক	গোমিক	গোমিঅ	গোবিঁঅ	গোঈঁ	গুঁই (পদবী)
গোরূপ	গোরূপ	গোরূব	গোরূঅ	গোরু	গোরু
গ্রাম	গাম	গাম	গাবঁ	গাবঁ	গাঁও, গাঁ
ঘাত	ঘাত	ঘাদ, ঘাঅ	ঘাব	ঘাঅ	ঘাও, ঘা
চন্দ্র	চন্দ	চন্দ	চন্দ	চান্দ	চাঁদ্
জ্যেষ্ঠতাত	জেট্‌ঠতাত, জেট্‌ঠদাদ	জেট্‌ঠআঅ	জেট্‌ঠাঅ	জেঠা	জেঠা
তাম্র, *তাম্ব	তম্ব	তম্ব	তম্ব	তাম্বা	তামা, তাঁবা
তন্ত্র	তন্ত	তন্ত	তন্ত	তান্ত	তাঁত্
ত্রীণি	*তীর্‌ণি, তিণ্ণি	তিণ্ণি	তিণ্ণি	তীনি	তিন্

	সংস্কৃত	প্রাচীন-প্রাকৃত	পরবর্ত্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
৮	দলপতি	দলপতি, দলবদি	দলবই	দলবই	দলঅই	দলই, দলুই (পদবী)
	দীপবর্ত্তিকা	দীপবট্টিকা	দীববট্টিআ	দীবঅট্টিঅ	দীঅটী	দেউটী
	দীপবৃক্ষ	দীপরুক্‌খ	দীবরুক্‌খ	দীঅরুক্‌খ	দিঅরুখা	দেউরুখা, দেরুখো
	দেবগৃহ	দেবঘর	দেবহর	দেঅহর	দেহরা	দেহরা
	নবনীত	নবনীত, নবণীদ	নবণীঅ	নবণীঅ	নঅণী	ননী
	প্রবিশতি	পবিসতি, পবিসদি	পবিসই	পইসই	পইসই	পৈশে, পশে
	প্রস্মরতি	পস্সরতি, পস্সরদি	পস্সরই	পস্সরই	পাসরই	পাসরে
	ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ, বম্ভণ, ববৃভণ	বম্‌হণ	বম্‌হণ	বাম্‌হণ	বামন্, বামুন্
	ময়া	ময়া	মএ	মই, মই	মই	মুই
	মৃত	মট	মড	মড	মড়া	মড়া

সংস্কৃত	প্রাচীন-প্রাকৃত	পরবর্ত্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
যাতি	যাতি, যাদি	জাই	জাই	জাই	জায় (যায়)
রাধিকা	রাধিকা, রাধিগা	রাহিআ	রাহিঅ	রাহী	রাই
বন্যা	বঞ্ঞা, বণ্ণা	বণ্ণা	বণ্ণ	বান	বান্
শুষ্ক	সুক্খ	সুক্খ	সুক্খ	সুখা	শুখা, শুকো
শৃণোতি	সুণোতি, সুণদি	সুণই	সুণই	শুণই	শুনে, শোনে
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝ	সাঞ্ঝ	সাঁঝ্
সমর্পয়তি	সমপ্পেতি, সমপ্পেদি	সমপ্পেই	সব প্পেই	সঁঅপই	সঁপে
সংক্রম	সংকম	সংকম	সংকবঁ	সাঙ্কবঁ	সাঁকো
সামন্তরাজ	সামন্তরাজ	সামন্তরাঅ	সাবঁন্তরাঅ	সাবঁন্তরা	সাঁত্‌রা (পদবী)
হস্ত	হত্থ	হত্থ	হত্থ	হাথ	হাত্

বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য বা আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সমস্ত বিশিষ্ট বা নিজস্ব শব্দ এই ভাবে আদি-আর্য্যভাষা বা প্রাচীন সংস্কৃত হইতে মধ্য-আর্য্যভাষা বা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে।

সংস্কৃতের (বৈদিকের) ব্যাকরণে যে সকল প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি ছিল সেগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বদলাইয়া বাঙ্গালা প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃতের 'হস্তেন', প্রাকৃতে হইল 'হত্থেণ', অপভ্রংশে 'হত্থেঁ', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হাথেঁ', তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্গালায় 'হাতে';—তৃতীয়ার '-এন' প্রত্যয় হইল '-এণ', ও পরে বাঙ্গালায় '-এ'-তে ইহার পরিণতি। সংস্কৃতে 'চলিতব্য', প্রাকৃতে হইল 'চলিদব্ব', পরে 'চলিঅব্ব', শেষে বাঙ্গালায় 'চলিব';—সংস্কৃতের '-তব্য' বা '-ইতব্য' প্রত্যয় বাঙ্গালায় হইয়া গেল '-ইব', ভবিষ্যদ্‌বোচক প্রত্যয়। আবার বহু সংস্কৃত প্রত্যয় প্রাকৃতে বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রাকৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন প্রত্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন—সংস্কৃত 'চন্দ্রস্য'—প্রাকৃতে 'চন্দস্‌স'; প্রাকৃতে আবার এই ষষ্ঠী বিভক্তি '-স্য > -স্‌স'-কে সুপরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি শব্দ উপরন্তু যোগ করা হইত; 'চন্দ্রস্য—চন্দ্রাণাম্‌', প্রাকৃতে 'চন্দস্‌স—চন্দাণং', তৎপরে 'কের' বা 'কর' পদ-যোগে 'চন্দস্‌স কের, চন্দস্‌স কর—চন্দাণং কের, চন্দাণং কর।' পরে 'কর' বা 'কের' প্রভৃতি পদ, '-স্‌স' বিভক্তিকে অনাবশ্যক ও অপ্রচলিত করিয়া দেয়—ষষ্ঠীর রূপ হয় 'চন্দকের, চন্দকর'; 'কের, কর' শব্দ সম্বন্ধ-বাচক প্রত্যয়ের স্থান গ্রহণ করে। 'কের', 'কর' বিভক্তিস্থানীয় শব্দের '-ক-', পদের অভ্যন্তরস্থিত হওয়ার ফলে

লোপ পায়, এবং 'চন্দকের, চন্দকর' স্থলে 'চন্দএর, চন্দঅর' রূপের উদ্ভব হয়, ও পরে ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় 'চান্দের, চান্দর', আধুনিক বাঙ্গালায় 'চাঁদের, (প্রাদেশিক) চাঁদর'; তুলনীয়: উড়িয়া একবচনে 'চান্দর', বহুবচনে 'চান্দঙ্কর'। এইরূপে সংস্কৃত '-স্য' প্রত্যয়ের বিলোপের পরে, সংস্কৃত 'কার্য' শব্দ হইতে প্রাকৃত উদ্ভূত 'কের' শব্দ, ও সংস্কৃত 'কর' শব্দ, ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হইয়া দাঁড়ায়, ও ইহাদের বিকারে বাঙ্গালায় ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় '-এর, -অর'-র উদ্ভব। সংস্কৃতের ব্যাকরণে বাঙ্গালা '-এর, -অর' প্রত্যয়ের অনুরূপ কিছুই মিলে না, ইহা প্রাকৃতের নবীন সৃষ্টি। প্রাচীন আর্য্যভাষার কিছু অংশ রহিয়া গেল, প্রাকৃত যুগে এবং পরে কিছু নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইল— এই ভাবে বৈদিক যুগের আর্য্যদের ভাষার ক্রমিক বিকাশের ফলে, বাঙ্গালা হিন্দী পাঞ্জাবী গুজরাটী মারহাট্টী প্রভৃতির উৎপত্তি।

ভারতের প্রাচীন আর্য্যভাষার পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আদি আর্য্যভাষার বিকার-জাত হইলেও, বাঙ্গালায় ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদসাধন-রীতি পাওয়া যায়, যাহা আর্য্যভাষায়, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃতে মিলে না। এইরূপ রীতি অনার্য্য-ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়—কারণ কোল (অস্ট্রিক্) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর অনার্য্য-ভাষায় এই সব রীতি বিদ্যমান, এবং সংস্কৃতের স্বগোত্রীয় ভারতের বাহিরের অন্য আর্য্যভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—'অনুকার-শব্দ'-গুলি; বাঙ্গালা 'জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ, সে আমায় বৈঠক-

খানায় বসে-টসে, তুমি একটু দেখ্‌বে-টেখ্‌বে', ইত্যাদি ; মূল শব্দটার প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জনধ্বনির স্থলে ট-কার বা অন্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনি বসাইয়া, 'ইত্যাদি' অর্থে মূল শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া যে পদ-সাধন-রীতি, তাহা সংস্কৃতে ও ভারতের বাহিরের আর্য্য-ভাষায় মিলে না ; অথচ ভারতের অনার্য্য ভাষাগুলির ইহা একটা লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। বাঙ্গালা ভাষার সহকারী ক্রিয়াও অনার্য্য ভাষার (বিশেষতঃ দ্রাবিড়ের) অনুরূপ—সংস্কৃতে ইহা অজ্ঞাত ; যেমন, সংস্কৃতে 'সদ্‌' ধাতু অর্থে 'বসা' ; 'নি + সদ্‌' = 'বসিয়া পড়া' ; 'বসা' ও 'পড়া' উভয় ধাতুর প্রতিরূপ মিলাইয়া সৃষ্ট 'বসিয়া পড়া'-র মত সহকারী ক্রিয়ার রেওয়াজ সংস্কৃতে নাই, অথচ বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় এগুলি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, এবং অনার্য্য ভাষায়ও এই প্রকার ক্রিয়া খুবই মিলে ; যেমন, 'খাওয়া'—'খাইয়া ফেলা', 'দেওয়া'—'দিয়া বসা' ; 'মারা'—'মারিয়া ফেলা' ; 'সরা'—'সরিয়া পড়া' ; ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে সহকারী ক্রিয়ার যোগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্ত্তন, বা প্রসার, অথবা সঙ্কোচ ঘটে। এই প্রকারের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলিকে বাঙ্গালা-ভাষা জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্যভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষা যাহা পাইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তি। আদি ভারতীয় আর্য্যভাষা (বৈদিক কথ্য ভাষা) কথাবার্ত্তায় অপ্রচলিত হইয়া গেলেও, তাহার পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যিক রূপ যে সংস্কৃত ভাষা, সেই সংস্কৃতের চর্চা কখনও লোপ পায় নাই। পণ্ডিতেরা বরাবরই সংস্কৃতে বই লিখিয়া আসিয়াছেন। এই সাহিত্যের সংস্কৃত হইতে আবশ্যক-মত

প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায় শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং হইতেছে। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অসংখ্য। সাধারণ দৈনিক জীবনের উপযোগী সরল ভাবদ্যোতক শব্দ অধিকাংশ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত উপাদান বা শব্দাবলীকে 'প্রাকৃতজ' বা 'তদ্ভব' উপাদান বলে ('তদ্' অর্থাৎ 'তাহা', অর্থাৎ 'সংস্কৃত',—'তদ্ভব' অর্থাৎ কিনা 'যাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত')। পূর্ব্বে এরূপ প্রাকৃতজ শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। আর সংস্কৃত হইতে যে সব শব্দ লওয়া হইয়াছে, সেগুলি 'প্রাকৃতজ' নয়, সেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় ধার-করা সংস্কৃত শব্দ। সরাসরি সংস্কৃত হইতে আগত এই সব শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দুই রকমে পাওয়া যায়; হয় এগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন আসে নাই—যেমন, 'কৃষ্ণ, চন্দ্র, গৃহিণী, নিমন্ত্রণ';—নয় এগুলির উচ্চারণে পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে এবং বানানেও সেই পরিবর্ত্তন ধরা হইয়াছে—যেমন, 'কেষ্ট, চন্দর, গিন্নী, নেমন্তন্ন'। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে 'তৎসম' বলে ('তদ্' অর্থাৎ 'তাহা' বা 'সংস্কৃত'—'তৎসম' অর্থাৎ কিনা 'যাহা সংস্কৃতের সমান'), এবং বিকৃত হইয়া গেলে তাহাকে 'ভগ্ন- বা অর্দ্ধ-তৎসম' বলে। অতএব সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গালায় এই তিন রূপে পাওয়া যায়—

১। প্রাচীন কথিত সংস্কৃতের (আদি ভারতীয় আর্য্য-ভাষার) শব্দ, যাহা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—প্রাকৃতজ বা তদ্ভব শব্দ।

২ (ক)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা অবিকৃতরূপে পাওয়া যায়—তৎসম শব্দ।

২ (খ)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা বিকৃতরূপে পাওয়া যায়—ভগ্ন-তৎসম বা অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ।

সংস্কৃত বা আর্য্যভাষার শব্দ ভিন্ন, বাঙ্গালায় অন্ত প্রকারের শব্দও আছে। আর্য্যভাষার প্রচারের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই অনার্য্য ভাষা দুইটী শ্রেণীতে পড়ে—কোল (অস্ট্রিক্), এবং দ্রাবিড়। কোল এবং দ্রাবিড় যাহারা বলিত, তাহারা নিজ নিজ ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের ভাষার কতক-গুলি শব্দ আর্য্যভাষায় আসিয়া যায়। প্রাকৃতে এইরূপ অনার্য্য শব্দ পাওয়া যায়, আবার প্রাকৃতের মারফৎ সংস্কৃতেও কতকগুলি প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য্যভাষায়ও বিস্তর অনার্য্য শব্দ মিলে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা প্রভৃতির অনার্য্য শব্দগুলিকে 'দেশী' নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় আগত এইরূপ দেশী শব্দ—'চাউল, তেঁতুল, লাঠি, ঢেঁকি, ডাগর, বাদুড়, কুকুর, গাড়ী, ঘোড়া', প্রভৃতি; ইহাদের কতকগুলির প্রতিরূপ শব্দ আবার সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে প্রাচীন কালে প্রচলিত অনার্য্য-ভাষাগুলির উচ্ছেদ হওয়ায়, এই সমস্ত অনার্য্য শব্দের মূল রূপ এখন লুপ্ত—তবে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার প্রয়াসের ফলে সেগুলির উদ্ধার হওয়া সম্ভব।

ভারতের আর্য্যভাষার (প্রাচীনকালের সংস্কৃত হইতে জাত, এবং পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত হইতে ধার-করা) শব্দ এবং অনার্য্য (দেশী) শব্দ ব্যতীত, বহু বিদেশী ভাষার শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়াছে। প্রাচীনকালে পারসীকেরা এবং গ্রীকেরা ভারতের

উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিল, ভারতের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। ইহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রাচীন ভারতের কথ্য ভাষা প্রাকৃতে গৃহীত হয়, এবং তাহা হইতে দুই-দশটা শব্দ সংস্কৃতেও যায়; এইরূপ কতকগুলি বিদেশী শব্দ—প্রাচীন পারসীক এবং গ্রীক—প্রাকৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষা-ও পাইয়াছে; যেমন, গ্রীক drakhme 'দ্রাখ্‌মে' শব্দ—অর্থ, 'একপ্রকার মুদ্রা'; ইহা প্রাচীন ভারতে 'দ্রম্ম' রূপে গৃহীত হইল, পরে 'দ্রম্ম' হইতে 'দম্ম', এবং 'দম্ম' হইতে বাঙ্গালা ও হিন্দী 'দাম' শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ 'মূল্য'। গ্রীক gōnos হইতে সংস্কৃত 'কোণ', গ্রীক kentron হইতে সংস্কৃত 'কেন্দ্র' (বাঙ্গালায় ইহার তদ্ভব রূপ এখন অপ্রচলিত)। তদ্রূপ পারসীক post 'পোস্ত্' শব্দ, যাহার অর্থ 'পার্চ্চমেণ্ট, বা লিখিবার জন্ত প্রস্তুত চামড়া'; ভারতে এই শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইল 'পুস্তক, পুস্তিকা' রূপে; ইহা প্রাকৃতে দাঁড়াইল 'পোত্থঅ, পোত্থিআ', এবং তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'পোথা', 'পুঁথি' 'পুথি'। প্রাচীন পারসীক mocak 'মোচক্' শব্দের অর্থ 'হাঁটু পর্য্যন্ত চামড়ার জুতা'; প্রাচীন ভারতে এই শব্দ গৃহীত হয়; এবং যে 'মোচক্' প্রস্তুত করে, সে 'মোচিক' নামে পরিজ্ঞাত হয়; এই 'মোচিক' হইতে 'চর্ম্মকার'-অর্থে আধুনিক 'মোচী, মুচি'। আবার পারস্তে mocak 'মোচক্' পরবর্ত্তী কালে mozah 'মোজহ্, মোজা' রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, ও ভারতে 'মোজা'-রূপে পুনরায় গৃহীত হয়। প্রাকৃতের মধ্য দিয়া এইরূপ দুই-চারিটা বিদেশী শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বেশী করিয়া বিদেশী শব্দের আমদানী আরম্ভ হইল তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে।

মোটামুটি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম হইতে আগত মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কেরা আসিয়া বাঙ্গালাদেশে লুট-তরাজ ও উপদ্রব আরম্ভ করিল, ও ক্রমে ত্রয়োদশ শতকে তাহারা বাঙ্গালাদেশ জয় করিল। তুর্কেরা ঘরে তুর্কী বলিত, কিন্তু সাহিত্যে ও রাজকার্য্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাদের দ্বারা ফারসী ভাষা বাঙ্গালা দেশেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজার ভাষা বলিয়া, ফারসী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর নানা দিক্ দিয়া পড়িল, বহু ফারসী শব্দ ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিল। বিশেষ করিয়া মোগল আমলে, ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে আসিতে থাকে। ফারসী ভাষা আরবী শব্দে ভরপূর; ফারসীর মধ্যে যে সব আরবী শব্দ আছে, সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালায় ঢুকিল। তদ্রূপ কতকগুলি তুর্কী শব্দও ফারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় আড়াই হাজারের উপর ফারসী শব্দ প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার ফারসী (অর্থাৎ মূল ফারসী, এবং আরবী ও তুর্কী হইতে গৃহীত) শব্দের উদাহরণ—

১। রাজ-দরবার, লড়াই, এবং শিকার-বিষয়ক শব্দ, যথা—আমীর, ওমরা, উজীর, খেতাব, খেলাৎ, তক্ত, তাজ, নকীব, মীর্জা, মালিক, হুজুর, কুচ-কাওয়াজ, জখম, তাঁবু, তোপ, ফৌজ, বন্দুক, বারুদ, বাজ, বাহাদুর, বক্সী, রসদ, শিকার; ইত্যাদি।

২। রাজস্ব, শাসন ও আইন-আদালত্-সংক্রান্ত শব্দ—আদম-শুমারী, আবাদ, এক্তিয়ার, ওয়াশীল, কব্জা, খাজনা, গোমস্তা, তালুক, দারোগা, দপ্তর, নাজির, পেয়াদা, বীমা, মাফ, মোহর,

রাইয়ৎ, সরকার, হদ্দ, হিসাব, অকু, অছিলা, আইন, উকীল, এজাহার, ওজর, দরখাস্ত, দলীল, নাবালক, নালিশ, ফরিয়াদী, ফেরার, মকদ্দমা, শনাক্ত, সালিস, সেরেস্তা, হাকিম, হেফাজৎ ; ইত্যাদি।

৩। মুসলমান ধর্ম্ম-সংক্রান্ত শব্দ—অজু, আউলিয়া, আল্লা, ইমান, ঈদ, কবর, কাফের, কাবা, গাজী, জুম্মা, তোবা, দর্গা, দোয়া, নবী, নমাজ, মসজিদ, মহরম, মুরশিদ, শরিয়ত্, শহীদ, শিয়া, সুন্নি, হদীস, হুরী ; ইত্যাদি।

৪। মানসিক সংস্কৃতি-সংক্রান্ত শব্দ—আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, খত্, গজল, তরজমা, মক্তব, বয়েত্, সেতার, হরফ, সরম, ইজ্জত্ ; ইত্যাদি।

৫। বাস্তব সভ্যতা, ব্যবসায়, শিল্প-কলা, বিলাস-দ্রব্য সংক্রান্ত শব্দ—অস্তর, আয়না, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আরক, কাগজ, কুলুপ, কিংখাব, কোর্ম্মা, কাঁচী, খাতা, খান্‌সামা, খাস্তা, গজ, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাবুক, জামা, জিন, জহরত্, তাকিয়া, দালান, দূরবীন, দোয়াত্, পাজামা, পোলাও, ফানুস, বরফী, বাগিচা, বুলবুল, মখমল, মলম, মিছরী, মীনা, মুহুরী, রিফু, রুমাল, লাগাম, সানকী, শাল, শিশি, সোরাই, হাউই, হাওদা, হুঁকা ; ইত্যাদি।

৬। বিদেশী জাতির নাম—আরব, আরমানী, ইহুদী, ইউনানী, কাফরী, হাবশী, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ ; ইত্যাদি।

৭। সাধারণ বস্তু বা ভাব বাচক শব্দ—অন্দর, আওয়াজ, আব-হাওয়া, আসল, কদম, কম, কোমর, খবর, খোরাক, গরজ, গরম, চাঁদা, চাকর, জলদি, জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, দখল, দরকার,

দাগ, দানা, দোকান, নগদ, নেশা, পছন্দ, পরী, বজ্জাত্, বোঁচ্‌কা, মজবুত্, মিয়াঁ, মোরগ, মুল্লুক, রোশনাই, হাওয়া, হাজার, হজম, হুজুগ ; ইত্যাদি।

ফারসী শব্দের পরে বাঙ্গালা ভাষায় ‘ফিরাঙ্গী’ বা পোর্ত্তুগীস শব্দের প্রবেশ হয়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে। ঐ সময়ে পোর্ত্তুগীস বণিকেরা বাঙ্গালাদেশে প্রথম আসে, এবং বাঙ্গালা-দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পোর্ত্তুগীস্‌দের প্রভাব বিশেষ প্রবল থাকে। পোর্ত্তুগীসরা নানা নূতন বস্তু বঙ্গদেশে আনায়ন করে, এই সকলের নাম পোর্ত্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। বাঙ্গালায় এক শতের কিছু অধিক পোর্ত্তুগীস শব্দ আছে। দৃষ্টান্ত—‘আনারস, তামাক, গরাদিয়া, চাবি, তোয়ালিয়া, বাল্‌তি, ইস্ত্রি, কামরা, গুদাম, পাঁউ(-রুটী), নীলাম, গির্জা, ক্রুশ, যীশু, পেয়ারা, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম, স্তুর্ত্তি’ ; ইত্যাদি।

বাঙ্গালাদেশে ফরাসী ও ওলন্দাজেরাও আসে, ইহাদের ভাষার দুই চারিটা শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। খেলার তাসের রঙের নামের মধ্যে তিনটী নাম ওলন্দাজ ভাষার—‘হরতন, রুইতন, ইস্কাবন’ (‘চিঁড়িতন’ বা ‘চিঁড়িয়া’ ভারতীয় শব্দ); ‘ত্রূপ’ বা ‘তুরুপ’, ‘বোম’ (ঘোড়ার গাড়ীর) ও ‘পিস্‌পাস্’ (ভাতে-মাংসে একত্র পাক-করা খাদ্য) ওলন্দাজ শব্দ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল হয়, এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশের রাজা হইয়া বসিল। ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান ইংরেজীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে—ফলে জীবনের প্রায় সব দিকেই ইংরেজী ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষায় পড়িতে আরম্ভ

করে। এখন যত দিন যাইতেছে, এই প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপরে ততই বেশী শক্তিশালী হইয়া কার্য্য করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা শত শত ইংরেজী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, ও ভবিষ্যতে আরও করিবে। বহু ইংরেজী শব্দ রূপ বদলাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন 'লাট, কার (সূতা), ইস্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, হাঁসপাতাল, কৌন্সিলি, আপিস, বগ্লস, ডিপুটি, আর্দ্দালী, গারদ, জাদরেল, টুল, টাপি, টুর্নী, পিজবোট, লজঞ্চুষ, সমন, হন্দর, গেলাস' ইত্যাদি। বহু ইংরেজী শব্দ এখন কেবল সাহিত্যেই ব্যবহৃত হয়—যেমন, 'ট্রাজেডি, আর্ট, প্লিষ্টোসীন, প্রোটোপ্লাজ্ম্, রোমাণ্টিক' প্রভৃতি। বিশেষ ব্যবসায়- বা শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু শব্দ আবার মুখে মুখে চলে। মোটের উপর, বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় বস্তু যত আসিতেছে, ততই তাহার ভাষায় ইংরেজী শব্দেরও প্রসার বাড়িতেছে।

বাঙ্গালা ভাষা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল হইল উদ্ভূত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে প্রাকৃতের পরিবর্ত্তনে; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রাকৃতজ শব্দ আছে; বিশুদ্ধ ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে; ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই আগত দেশী বা অনার্য্য শব্দও কিছু কিছু আছে; এবং ইহাতে আগত বিদেশী ভাষা ফারসী, পোর্ত্তুগীস ও ইংরেজী হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও অন্য লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে এই ভাষা অপূর্ব্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার আদি বা প্রাচীন যুগ, খ্রীষ্টাব্দ ১২০০ পর্য্যন্ত—মোটামুটী তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ-বিজয় পর্য্যন্ত; এই সময়েই

বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ। ভাষা এই যুগে সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা তখনও প্রাকৃতের ধরণ অনেকটা রক্ষা করিতেছে।

বাঙ্গালার মধ্য-যুগ ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত। এই যুগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে: [ক] যুগান্তর কাল—১২০০ হইতে ১৩০০ পর্য্যন্ত। বাঙ্গালাভাষাকে আমরা যে সাধু ভাষার রূপে এখন দেখিতে পাইতেছি, এই সময়ে ইহা সেই রূপটী পাইতেছিল। এই সময়ের সাহিত্য বা নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। [খ] আদি মধ্য-যুগ বা চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগ—১৩০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল করিয়া পত্তন হয়, নানা বিষয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি আরম্ভ হয়। [গ] অন্ত্য মধ্য-যুগ—১৫০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির যুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক। এই মধ্য-যুগের মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় উচ্চারণ-ঘটিত কতকগুলি পরিবর্ত্তন আসিয়া যায়, যাহার ফলে ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন অবস্থা হইতে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিবর্ত্তিত হয়—যেমন 'রাখিয়া', এই প্রকারের প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ, পরে 'রাইখিয়া,' 'রাইখ্যা,' 'রেইখ্যা,' 'রেখ্যে' প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই মধ্য-যুগের শেষে চলিত ভাষায় 'রেখে'-তে রূপান্তরিত হয়। সম্পূর্ণ শব্দ 'সাথুয়া' তদ্রূপ 'সেথো' রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'সাথুয়া—সাউথুয়া—সাইথুয়া—সেথো'। মধ্য-যুগের অবসানকালে বাঙ্গালা দেশে ইংরেজদের অধিষ্ঠান হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের যত্নে বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপার প্রচলন হয়, এবং গদ্য-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

১৮০০ সালের পরে বাঙ্গালার আধুনিক যুগের আরম্ভ। বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অতি গৌরবময় আসনে উন্নীত হইয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক চিন্তার ধারাকে বাঙ্গালা ভাষা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে। নানা লক্ষণীয় পরিবর্তনের মধ্যে, কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে সাধুভাষার পার্শ্বে সাহিত্যের আসনে উন্নীত করা এই যুগের মধ্য ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা—আজকাল সাধারণতঃ দেবনাগরী বর্ণমালায় সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিয়া অনেকের ধারণা যে দেবনাগরীই ভারতের প্রাচীনতম বর্ণমালা, এই দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পরস্পর ভগিনী-সম্পর্কে সম্পর্কিত। দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজপুতানা এবং সংযুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র ইহার প্রসার ঘটিয়াছে। ভারতের আর্য্যভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায় খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অনুশাসনে। এই বর্ণমালা বা লিপির নাম 'ব্রাহ্মী' লিপি। এই ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মতবাদ প্রচলিত আছে—[১] ফিনীশিয়া দেশের প্রাচীন বর্ণমালার আধারের উপরে ভারতের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মী বর্ণমালা সৃষ্ট হয়; ও [২] ব্রাহ্মী বর্ণমালা মূলে বিদেশীয় নহে, ইহা ভারতেই উদ্ভূত হয়—মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীল-মোহরে যে লিপি বিদ্যমান, তাহা প্রায় চারি হাজার বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু সে লিপি এখনও পড়া

যায় নাই, এবং খুব সম্ভব তাহা কোনও অনার্য্য ভাষার লিপি—আর্য্য ব্রাহ্মী লিপি তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। ব্রাহ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, বর্ণগুলি মাত্রা-রেখা-হীন। ব্রাহ্মী অক্ষর এই প্রকারের: ዘ = অ, + = ক, ᒣ = খ, Λ বা ∩ = গ, d = চ, ɛ = জ, Ч = ঝ, h = ঞ, C = ট, O = ঠ, ᒋ = ড, λ = ত, ⊙ = থ, D বা O = ধ, ⊥ = ন, ᒪ = প, □ = (বর্গীয়) ব, ⊣ = ভ, । বা ⌇ = র, ᖶ = স ; ইত্যাদি।

ব্রাহ্মী অক্ষরগুলি দক্ষিণ-ভারতে একটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহা হইতে দক্ষিণ-ভারতের গ্রন্থ, মালয়ালম্, তামিল, তেলুগু-কানাড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার উদ্ভব হয়।

ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত কতকগুলি ভারতীয় লিপি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে ভারতের বাহিরে নীত হয়, এবং সেগুলি হইতে বৃহত্তর ভারতের নানা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটিয়াছে—যথা—ব্রহ্মদেশের মোন্ বা তালৈঙ্ এবং বর্ম্মী লিপি ; কম্বোজের কম্বোজ লিপি, ও তাহা হইতে উদ্ভূত শ্যামী লিপি ; প্রাচীন চম্পার লিপি ; যবদ্বীপীয় লিপি, এবং দ্বীপময় ভারতের নানা লিপি ; তিব্বতী লিপি ; চীন, কোরিয়া ও জাপানে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপি ; মধ্য-আসিয়ার খোতানের পূর্ব্বী-ইরানী লিপি ; কুচা-নগরীর 'তুষার' লিপি ; প্রভৃতি। এগুলি সমস্তই বাঙ্গালা লিপির জ্ঞাতি।

উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্ত্তিত হইয়া কালক্রমে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের পরে সপ্তম শতকে তিনটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে—এই তিন রূপের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে (কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে) প্রচলিত রূপের নাম 'শারদা', দক্ষিণ-পশ্চিমে

(রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে এবং মধ্য-দেশে) প্রচলিত রূপের নাম 'নাগর', এবং পূর্ব্ব-ভারতের রূপের নাম 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মী লিপির এই 'কুটিল' রূপ-ভেদ হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি, 'নাগর' হইতে দেবনাগরীর, এবং 'শারদা' হইতে পাঞ্জাবের গুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষর পরস্পর হইতে স্বাধীন, এবং ইহারা মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা তাহার জন্মকাল হইতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে, অবশ্য এই বঙ্গাক্ষরের আদিম আকার আজকালকার বঙ্গাক্ষর হইতে কতকটা পৃথক্ ছিল, এবং সেই প্রাচীন রূপের বিকারের ফল আধুনিক বঙ্গাক্ষর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য বাঙ্গালা দেশের তথা ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, এবং জগৎকে আধুনিক ভারতবর্ষের একটী বড় দান। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এক ইংরেজ অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মিলে, সে দুইটী ভাষা হইতেছে ইংরেজী ও বাঙ্গালা। সংস্কৃত, পালি, তামিল, উত্তর-ভারতীয় ভাষাবলী ('হিন্দী'), ও বাঙ্গালা—এই কয়টীই ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্পদ্ ধারণ করিয়া আছে। সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী, লাতীন, ফরাসী, ইংরেজী, জরমান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের তুলনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও, আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন যথেষ্ট উচ্চে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবীন সাহিত্যকে লইয়া—গত ৭০।৮০ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ ও সঙ্ঘাতের ফলে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া। বাঙ্গালা ভাষায় বেশ বড় একটী পুরাতন সাহিত্য আছে, গত হাজার বছরের অধিক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় সেই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং তাহাতে কতকগুলি বড় বড় কবি উচ্চদরের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ও অনুবর্ত্তী

লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ব্বকথা আলোচনা করিতে গেলে দুইটী জিনিস আমাদের চোখে ঠেকে। প্রথম—লেখকদের সম্বন্ধে প্রায় কোনই খবর পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ তাঁহাদের সময়ের সম্বন্ধে। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিদের বিষয়ে কিংবদন্তী, এবং কচিৎ বা দুই একটা ঐতিহাসিক নামের সঙ্গে তাঁহাদের সংযোগ—ইহা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মিলে না। তারপর, অতি আধুনিক যুগ ছাড়া, তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও পাওয়া যায় না। তাঁহারা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের হাতে লেখা বা তাঁহাদের জীবৎকালে লিখিত পুঁথিতে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু কাগজ বা তালপাতার পুঁথি বেশী দিন টিকিত না, নূতন করিয়া নকল করিতে হইত। এই নকলের সময়ে ভ্রম-প্রমাদ ঢুকিত, বাদ-সাদ পড়িত,—নকলকার পুরাতন লেখা ভাল করিয়া পড়িতে না পারায় বা পড়িয়া বুঝিতে না পারায়, লেখার কালে তাহার হাতে ভাষা ও শব্দ বদলাইয়া যাইত, এবং নকলকার নিজে কবি হইলে, ও নিজের রচনা নিজেরই ভাল লাগিলে, তাহা প্রতিষ্ঠাবান্ কবির লেখা বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিলে খুশী হইত (তখনকার দিনে নিজের নামের চেয়ে নিজের লেখার প্রতি মমতা-বোধ বেশী করিয়া হইত বলিয়াই ইহা ঘটিত)। এখন নানা রকমে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ বা জীবৎকাল নির্দ্ধারণ

করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন, পাঁচখানা পুঁথি মিলাইয়া তাহা স্থির করিবার প্রয়াস হইতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের আলোচনায় কবিদের নাম ও খ্যাতি, এবং তাঁহাদের নামে প্রচলিত রচনার সমষ্টি, ইহা ছাড়া নিশ্চিত-তর কিছু সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্থক আলোচনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা কঠিন বস্তু হইয়া আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও দুইটা বিষয় লক্ষ্য করিবার—প্রথম, গদ্য সাহিত্যের অভাব; এবং দ্বিতীয়, সাহিত্যে অল্প কয়েকটা বিষয় লইয়াই কারবার। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যত্র গদ্যের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। ছাপাখানার যুগের পূর্ব্বে গদ্যে লেখা দুই একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি নগণ্য; সমস্ত সাহিত্যটাই পদ্যে লেখা,—পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি মামুলী ছন্দে রচিত; কাব্য ও গান ছাড়া, জীবন-চরিত, বংশাবলী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দর্শন, চিকিৎসা—যাহা কিছুর উপরে বই লেখা হইয়াছে, সবই পদ্যে। সাহিত্যে আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যের অভাবটাও বড় চোখে লাগে। বেশীর ভাগ পাওয়া যায় গান ও কাব্য। গান—ধর্ম্ম-বিষয়ক, প্রেম-বিষয়ক; কাব্য—প্রাচীন সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কথা লইয়া, বাঙ্গালা দেশের পাত্র-পাত্রিদের কথা লইয়া, দেব-দেবীর কাহিনী লইয়া। সংস্কৃত ইতিহাস-পুরাণকথা, ও গৌড়-বঙ্গীয় পুরাণকথা—মুখ্যতঃ ইহাই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবন-চরিত ও দার্শনিক আলোচনা-

মূলক সাহিত্য দেখা দিল, এদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা মস্ত অভাবের পূরণ হইল। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চ জাতির বংশ-পরিচয় লইয়া 'কুলশাস্ত্র' বা 'কুলজী' নামে অনেক বই লেখা হয়, কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-পদ-বাচ্য নহে। ঐতিহাসিক কথা এবং দেশ-বর্ণন অবলম্বন করিয়া দুই চারিখানি বই অষ্টাদশ শতকে লেখা হয়। কিন্তু মোটের উপর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছিল অতি অল্প—তিনটী চারিটী বিষয় লইয়া এই সাহিত্যের পুঁজি-পাটা। ইহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দী বা তামিল সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী, এবং সেই যুগের ফারসী, আরবী, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিত্যের প্রসার ও বিষয়-বৈচিত্র্য আরও অনেক বেশী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একঘেয়ে' ভাবটা বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের সাত শত বিভিন্ন অনুবাদ, সেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়া পুরুষানুক্রমে কবিদের একঘেয়ে' ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য রচনা, সেই নানা কবির হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বারমাস্তার একই ভাবে বর্ণনা। এই একঘেয়ে' ভাব, আর কবিদের গতানুগতিকতা—যেন বাঙ্গালা দেশের পাহাড়-পর্ব্বতের অভাব-জনিত প্রাকৃতিক একঘেয়েত্বের—সেই মাঠের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া, বৈচিত্র্যহীন প্রাকৃতিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব। বিষয় এক, এবং রচনারও নূতনত্ব নাই—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন কোন কবির প্রতিভা, তাঁহার সহৃদয়তা ও সূক্ষ্ম দর্শন-শক্তি, তাঁহার রসজ্ঞান ও কৌতুক- এবং

হাস্য-রস-বোধ, তাঁহার ভাষার উপরে অধিকার ও ভাষা-প্রয়োগের শক্তি, এবং তাঁহার সত্যকার সৌন্দর্য্য-বোধ—এই সবে মিলিয়া সাহিত্যে এই গতানুগতিকতা-জনিত এবং নবীনতার অভাব-জনিত মরুভূমির মধ্যেও উদ্যানের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন হয়, মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কীদিগ-কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্বেই—যে হিন্দু-যুগে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয়, সেই হিন্দু-যুগেই। উত্তর-ভারতের ও বিহার-প্রদেশের মৌর্য্য রাজারা বাঙ্গালা দেশ বিজয় করিলেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে। মৌর্য্য রাজাদের অধীনে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষার প্রসার হয় নাই বলিয়া মনে হয়, দেশের লোকে কোল (অস্ট্রিক), দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল শ্রেণীর অনার্য্য ভাষা বলিত। মগধ বা বিহার প্রদেশ হইতে মাগধী-প্রাকৃত বাঙ্গালা দেশে আসিল। এই প্রাকৃত এবং ইহার বিকারে জাত 'মাগধী-অপভ্রংশ' বাঙ্গালাদেশ-ময় ছড়াইয়া পড়িল, দেশের অধিবাসীরা নিজেদের অনার্য্য ভাষা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে এই আর্য্যভাষা গ্রহণ করিল। চীনা পরিব্রাজক Hiuen Thsang হিউএন্-থ্সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশে আসেন; তাঁহার বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে তখন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। মাগধী-প্রাকৃত ভাষা বদলাইয়া বদলাইয়া, মাগধী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়া, প্রাচীন বঙ্গভাষার রূপ ধারণ করে। ঠিক কোন্ সময়ে প্রাকৃতের বিশেষত্বের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালার বিশেষত্ব আসিয়া যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না, তবে এখন থেকে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

তখন বাঙ্গালাদেশে পাল-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭৪০-এর দিকে এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাড়ে-তিন শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার এই পাল-বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। পরে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশ সেন-বংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। সেন-বংশীয় রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশ বিদেশী মুসলমান তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হয়।

পাল-বংশীয় রাজারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন, সেন-বংশীয়েরা ছিলেন শৈব। তখনকার কালে ভারতে বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী-দের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী ছিল না। পাল-রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশ শান্তি এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা দেশে বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতদের হাতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও অনুষ্ঠান লইয়া সংস্কৃত ভাষায় একটী বড় সাহিত্য গড়িয়া উঠে, বিহার ও বাঙ্গালা দেশে ভাস্কর্য্য ও শিল্পের একটী অভিনব ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ-ভাষা বাঙ্গালার দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধমতের আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেন। অনুমান হয়, বৈষ্ণব ও শৈবেরাও এইরূপ পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইরূপ পদের অস্তিত্ব আর নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যদের পদ বাঙ্গালা-দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নেপালে এইরূপ কতকগুলি পদ একখানি প্রাচীন পুঁথিতে রক্ষিত হইয়া ছিল—নেপালের বৌদ্ধ বিহারে স্থবিরদের মুখেও এইরূপ পদ আরও প্রচলিত আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৩ সালে এই পুঁথিখানি ছাপাইয়া দিয়াছেন; ইহাতে ৪৭টী পদ খণ্ডিত এবং বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি হেঁয়ালীর

ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ সরল, কিন্তু ভিতরের আধ্যাত্মিক অর্থ বোঝা কঠিন। একটা পদের নমুনা নিয়ে দেওয়া হইল—ইহার ভাষার বানান একটু-আধটু বদলানো হইয়াছে :—

কাহে রে ঘেনি মেলি আচ্ছৌ কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥১॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খণহি ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥২॥
তিণ ন ছুবঁই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জাণী ॥৩॥
হরিণী বোলই—এ হরিণা, শুণ তো।
এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥৪॥
তুরংগন্তে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই,—মূঢ়া হিঅহি ন পইসই ॥৫॥

অর্থ—"ওরে, কাহাকে লইয়া (ঘেনি) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়া (মেলি) আমি কিসে আছি? চৌদিকে পরিবেষ্টিত হাক (অর্থাৎ শিকারীদের শব্দ) পড়ে (অর্থাৎ শোনা যায়)। আপনার মাংসের জন্তই হরিণ [জগতের] বৈরী। শিকারী (অহেরী) [বৌদ্ধগুরু] ভুসুকু এক ক্ষণও ছাড়ে না। হরিণ তৃণ ছোঁয় না, পানী পিয়ে না। হরিণী বলে—'এই হরিণ, তুই শোন্; এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত (পলায়িত) হও।' শীঘ্র যাইতে যাইতে (তুরং গন্তে) হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু [বৌদ্ধগুরু] ভণে—মূঢ়ের হিয়ায় [এই পদের তাৎপর্য্য] পশে না।"

এইরূপ কতকগুলি প্রহেলিকাময় কবিতা লইয়া প্রাচীনতম বঙ্গীয় সাহিত্য। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন যুগে বাঙ্গালা ভাষায় আর কি ছিল, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতে পারে মাত্র,—যতক্ষণ না এই যুগের অন্ত লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে ততক্ষণ স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে খুব সম্ভবতঃ এ যুগেও বৈষ্ণব

গীতি-কবিতা ছিল, এবং পরবর্ত্তী কালের মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ শিব, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ, মনসা, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যও হয় তো ছিল।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইতে খ্রীষ্টীয় ১২০০ পর্য্যন্ত হইল বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বা আদি যুগ। তুর্কীদের বাঙ্গালা বিজয়ের কালে দেশের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল—১২০০ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য বা বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীষু মুসলমান তুর্কীদের হাতে বাঙ্গালার হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এটা একটা যুগান্তরের কাল, দেশময় মারামারী, কাটাকাটী, নগর ও মন্দির-ধ্বংস, অভিজাতবংশীয় ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ, প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল; এরূপ সময়ে বড় দরের সাহিত্য-সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। ক্রমে দেশে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, শান্তি ও স্বস্তি আবার ফিরিয়া আসিল। দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে যেমন মুসলমান ধর্ম্মের প্রসার ঘটিতে লাগিল, তেমন হিন্দুদের মধ্যেও নিজেদের সংস্কৃতিকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা আরম্ভ হইল; এবং দেশে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের শিক্ষায় যেমন সংস্কৃতের চর্চ্চার পুনরায় আরম্ভ হইল, তেমনি বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া সাধারণ্যে এইগুলির পুনঃ-প্রচারের প্রয়াস দেখা দিল; দেশের কবিরা প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ এবং খণ্ড-কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। ইহাই হইতেছে

মুসলমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা। উচ্চবর্ণের হিন্দু অর্থাৎ শিক্ষিত হিন্দু এই কাজে অগ্রণী হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এক নবীন যুগে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালা-দেশে যে সমস্ত তুর্কী ও অন্ত বিদেশী মুসলমান বসবাস করিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গালাভাষী হইয়া পড়িল—তখনও পশ্চিমের উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই—রাজকার্য্যে ফারসী এবং ধর্ম্মকার্য্যে আরবী ব্যবহার করিলেও ইহারা বাঙ্গালা বলিত ও বুঝিত, এবং অনেকের ঘরে কেবল বাঙ্গালাই ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন, উচ্চবংশীয় হিন্দু কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীরও লোকে কিছু পরিমাণে রাজার জাতির ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইল; মুসলমান হওয়ার পরও মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি টান থাকা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক-ই ছিল। এই সব কারণে, বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদের সভায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতেই যে দেশ-ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সহানুভূতি এবং দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে যেরূপ যুগ-বিভাগ করিতে পারা যায় ("বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ যুগ-বিভাগ প্রশস্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগগুলি এই—

১। প্রাচীন বা মুসলমান-পূর্ব্ব যুগ—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

২। তুর্কী-বিজয়ের যুগ—১২০০ হইতে ১৩০০ পর্য্যন্ত।

৩। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্-চৈতন্ত যুগ—১৩০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত।

৪। অন্ত্য মধ্য-যুগ—১৫০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত।

[ক] চৈতন্য-যুগ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রধান যুগ—১৫০০-১৭০০।

[খ] অষ্টাদশ শতক (নবাবী আমল)—১৭০০-১৮০০।

৫। আধুনিক বা নবীন বা ইংরেজী যুগ—১৮০০ হইতে।

প্রথম দুই যুগের কথা অগ্রেই বলা হইয়াছে। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্-চৈতন্য যুগ—ইহার প্রথম এক শত বৎসরের খবর আমরা বিশেষ কিছু জানি না। খুব সম্ভব এই যুগে (এবং আংশিক ভাবে ইহার পূর্ব্বের যুগে) বাঙ্গালা ভাষায় বেহুলা-লখিন্দর, লাউসেন, রাজা গোপীচাঁদ, এবং কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কথা লইয়া প্রথম কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। সে সব কাব্য এখন নাই, তবে তাহাদের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বহু কবি বড় বড় 'মঙ্গল-কাব্য' রচিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পুনরভ্যুদয়ের ফলে, একদিকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির আখ্যায়িকা লইয়া বাঙ্গালায় কাব্য রচনা আরম্ভ হইল—প্রাচীন ভারতের গৌরব ও পুণ্যময় স্মৃতি এইরূপে বাঙ্গালার জনসাধারণের মানস-চক্ষের সমক্ষে ধরা হইল; অন্য দিকে দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম-বিগ্রহের এবং পারিবারিক আদর্শের কাহিনী লইয়া খাঁটী বাঙ্গালী পুরাণকথা—বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনার কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা—এইগুলিকে লইয়া বড় দরের সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা হইল।

কবি জয়দেব তুর্কীদের আগমনের পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে পদ রচনা করিয়া, একটী সুন্দর সংস্কৃত কাব্য-মধ্যে এই পদ-সমূহ গ্রথিত করিয়া 'গীতগোবিন্দ কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেব কবির পদ-রচনার ধারা বাঙ্গালা

ভাষায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন 'বড়ু চণ্ডীদাস'—যাঁহাকে বাঙ্গালার পুরাতন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যথাযথ কোনও সংবাদ জানা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ণব সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস' নামক কবির সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে-সব গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী নাই। এইটুকু অনুমান হয় যে, বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন কালে একাধিক চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন। দুইজন (এবং সম্ভবতঃ তিনজন) চণ্ডীদাস-নামা পদ-রচয়িতা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আদি বা প্রাচীনতম যিনি, তিনি 'বড়ু' এই উপনামে খ্যাত ; ইনি বাসলী-দেবীর সেবক ছিলেন, এবং ইহার আর একটী নাম ছিল 'অনন্ত', ও উপাধি ছিল 'বড়ু' ; এই প্রথম চণ্ডীদাসের, বা 'বড়ু' চণ্ডীদাসের-ই পদ চৈতন্যদেব শুনিতেন,—ইনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার ব্যক্তি, এবং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১৪০০ সালের পূর্ব্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। 'বড়ু' চণ্ডীদাস পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর (নান্নুর, বা নানোর) গ্রাম, এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রাম, এই উভয় স্থলে 'চণ্ডীদাস' কবির বাস ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান ; উভয় গ্রামেই প্রবাদ প্রচলিত যে স্থানীয় গ্রাম-দেবী (নান্নুরের বিশালাক্ষী বা বাশুলী, এবং ছাতনার বাশুলী) চণ্ডীদাসের উপাস্য ছিলেন। আদি বা 'বড়ু' চণ্ডীদাস নান্নুরে বাস করিতেন, অথবা ছাতনায়, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ; দুইটাই প্রাচীন স্থান। তবে অনুমান হয় যে পরবর্ত্তী যুগে আদি বা 'বড়ু' চণ্ডীদাসের নাম-যশ ও লোক-প্রিয়তা এত বিস্তৃত হয় যে, অন্য লোকের লেখা বিস্তর পদ তাঁহার নামে

চলিতে থাকে। 'বড়ু' ভিন্ন, 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস নামে সম্ভবতঃ আর একজন পদ-কর্ত্তা ছিলেন, তবে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্ভিন্ন 'দীন' চণ্ডীদাস নামে পরবর্ত্তী এক কবি বহুশত পদময় শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এক বিরাট্ কাব্য রচনা করেন। এই 'দীন' চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে আমরা অপেক্ষাকৃত নিঃসংশয় ; ইনি চৈতন্যদেবের বহু পরের লোক। 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বলিয়া কোনও কবি থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী ; তবে ইহা সম্ভব যে সাধারণ কীর্ত্তনিয়া ও অন্য কবির হাতে বড়ু-চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে সুন্দর কবিতা-রাশি সৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি না বড়ু-চণ্ডীদাসের, না উপরে উল্লিখিত দীন-চণ্ডীদাসের—সেগুলি 'চণ্ডীদাস'-নামে প্রচলিত বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের সম্মিলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, চণ্ডীদাস নামের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ১০০০-এর অধিক পদ এখন 'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা, এবং যে আকারে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত এই পদগুলি পাইতেছি তাহাদের মধ্যে কতটুকুই বা মূল রচনা (বড়ু, দ্বিজ বা দীনের) রক্ষিত আছে, এ-সব কথা নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। অধিকাংশ পদ পরবর্ত্তী পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে ; লেখক ও গায়কের মুখে মূল রচনার ভাষা বদলাইয়াছে। দুই বা তিন চণ্ডীদাস (বড়ু, ও দীন, এবং সম্ভবতঃ দ্বিজ) এবং অন্য কবির লেখা মিলিয়া এক 'চণ্ডীদাস' এখন আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান। ভাবে ও ভাষায় অনৈক্যযুক্ত এই পদ-সমষ্টি বিশ্লেষ করিয়া সাজানো এক কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে বড়ু-চণ্ডীদাসের লেখা

একখানি কাব্য (‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’) পাওয়া গিয়াছে, ইহার পুঁথিখানি খুবই প্রাচীন, বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রীষ্টীয় ১৪৫০ হইতে ১৫২০-র মধ্যে পুঁথিখানি অনুলিখিত হইয়াছিল। এই পুঁথির ভাষার প্রাচীনতা দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে বড়ু-চণ্ডীদাসের খাঁটী রচনা অনেকটা অবিকৃত-রূপে পাওয়া যাইতেছে। প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীতে যাহা মিলিতেছে, তাহার অধিকাংশই বড়ু-চণ্ডীদাসের নহে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে, ‘চণ্ডীদাস’-এর নামে প্রচলিত ১০০০-এর অধিক পদের মধ্যে ২৫।৩০টীর বেশী বড়ু-চণ্ডীদাসের নহে। ইহার অধিকাংশই ‘দীন’-চণ্ডীদাসের রচিত পদময় কাব্য হইতে গৃহীত। কতকগুলি অতি সুন্দর পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাই, কিন্তু সেগুলি ‘বড়ু’ ও ‘দীন’ ভিন্ন অন্য কাহারও লেখা। আবার, সহজিয়া সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত সহজিয়া মতের বহু পদ ‘চণ্ডীদাস’-রচিত পদসংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ‘চণ্ডীদাস’ এই নামের আড়ালে যে কয় জন শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ কবি বিদ্যমান, তাঁহাদের পদের যথাযথ আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জটিলতম বিষয়।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া বড়ু-চণ্ডীদাস-প্রমুখ বাঙ্গালার পদরচয়িতৃগণ, একাধারে গভীর ভগবদনুভূতি এবং প্রেমিক হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয়, উভয়ই সার্থকভাবে দর্শাইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং প্রেমের সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক এই পদাবলী একটী অমূল্য বস্তু।

বড়ু-চণ্ডীদাসের কিছু পরে কৃত্তিবাস ওঝার উদ্ভব। রামায়ণের গল্প বাঙ্গালায় যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন

প্রথম ও প্রধান কবি। কিন্তু ইঁহার জন্মের সন তারিখ লইয়া নিশ্চয়তা নাই। তবে ইঁহার জন্ম খ্রীষ্টীয় ১৩৯৯ সালে হইয়াছিল, এইরূপ অভিমত প্রকাশিত ও গৃহীত হইয়াছে। খুব সম্ভব, সমগ্র বঙ্গদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বংশীয় গণেশ বা দনুজমর্দ্দনদেবের সভায় ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বাঙ্গালা রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। এই রামায়ণের প্রাচীনতম পুঁথি কিন্তু ১৫৮০ ও ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা রামায়ণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে সংশোধিত ও বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত আকারে শ্রীরামপুরের পাদরিদের দ্বারায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল; এই মুদ্রণের ফলে কৃত্তিবাসের প্রচার অন্যান্য রামায়ণের কবিদের অপেক্ষা যে অধিক করিয়া হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বা তাঁহার বাল্যকালে আর যে সমস্ত কবি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বরিশাল-গৈলা-ফুল্লশ্রীগ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্ত, মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ বেহুলা-লখিন্দরের গল্প অবলম্বনে 'পদ্মা-পুরাণ' লেখেন; এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা লইয়া বর্দ্ধমান-কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু (উপনাম গুণরাজ খাঁ) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে সুন্দর একখানি কাব্য লেখেন (১৩৯৫-১৪০২ শক=১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইঁহারা পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন। বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান রাজা সুলতান হোসেন শাহ (ইঁহার রাজত্বকাল ১৪৯৩—১৫১৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহারই পুত্র রাজা নসরত খাঁর অধীনে চট্টগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ছুটী খাঁ বাঙ্গালায় মহাভারতের অনুবাদ করান।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বের এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও বীরগাথা এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা,—এইগুলি লইয়া ব্যাপৃত ছিল। এই সময়ে পূর্ব্ব-ভারতে মিথিলা-প্রদেশ ছিল সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র। কাশী, দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্গালাদেশ যখন তুর্কীদের অধীনে, তখন মিথিলা স্বাধীন ছিল, মিথিলার হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে পণ্ডিতেরা নিরুদ্বেগে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন। বাঙ্গালীর ছেলেরা সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া ন্যায় ও স্মৃতি পড়িবার জন্য, মিথিলায় যাইত। মিথিলার দেশভাষার নাম মৈথিলী; ইহা বাঙ্গালার মত-ই মাগধী-প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, এবং অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার সহিত মিলে। মৈথিল পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার আদর করিতেন; জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর (খ্রীঃ ১৩২৫) -প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মৈথিলী ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। মিথিলার কবিরা নানা বিষয়ে গান বাঁধিতেন। মিথিলার এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিদ্যাপতি ঠাকুর (আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০-এর মধ্যে ইঁহার জীবৎকাল)। বিদ্যাপতি অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন; তাঁহার ভাব যেমন মার্জ্জিত ও সুন্দর, ভাষাও ছিল তেমনি মধুর। বাঙ্গালীর ছেলেরা মিথিলায় গিয়া সংস্কৃত তো পড়িত-ই, মৈথিলীতে রচিত গানও তাহারা শিখিত। এই সব গান তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়, বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যাপতির পদের খুব নাম ও আদর হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির মৈথিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটী ভাঙ্গিয়া

কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়া গেল, কোথাও নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া বসিল, আবার কোথাও বা পশ্চিমের (মথুরা-অঞ্চলের) হিন্দীরও রূপ ইহাতে দুই এক জায়গায় আসিয়া গেল। এইরূপে বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী, বাঙ্গালাদেশে এক নূতন মিশ্র রূপ ধরিয়া বসিল, তাহা না-মৈথিলী না-বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিমা হিন্দীর এবং পশ্চিমা অপভ্রংশেরও ছিটাফোঁটা আছে ; কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে, এবং লালিত্যে ও শ্রুতি-মাধুর্য্যে এই মিশ্র ভাষা অনুপম হইয়া দাঁড়াইল। পরে এই ভাষার নাম-করণ হইল 'ব্রজবুলী'—অর্থাৎ যে বুলী বা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা গীত হয়। বিদ্যাপতির মূল মৈথিল পদের ব্রজবুলী রূপের অনুকরণ করিয়া পরে বাঙ্গালা দেশের অন্য অন্য কবিরা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীত রচনা করিতে লাগিলেন ; এইরূপে এই কৃত্রিম কবিতার ভাষা ব্রজবুলীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছায়ায় নূতন এবং মনোহর একটী বড় সাহিত্য দাঁড়াইয়া গেল। এখনও অনেক বাঙ্গালী কবি এই ব্রজবুলীতে কবিতা লিখিয়া থাকেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কতকগুলি অতি সুন্দর গীতি-কবিতা ইহাতে লিখিয়াছেন ('ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')। বাঙ্গালায় ব্রজবুলী ভাষার উদ্ভব চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বেই হইয়াছিল ; আসামে আমরা পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই ব্রজবুলী কবিতা পাই, উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের জীবনকালেই পাই।

ব্রজবুলীতে বিকৃত বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গালায় এত লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে, বিদ্যাপতি যে আসলে বাঙ্গালার কবি নহেন, মিথিলার কবি, বাঙ্গালী তাহা ক্রমে ভুলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম, আদি-যুগের বৈষ্ণব কবি বোধে এমনি

ভাবে সম্মিলিত, যে একের নাম করিতে আর জনের নাম আপনিই আসিয়া যায়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান হয়। ইঁহার ব্যক্তিত্ব বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা আনিয়াছিল—বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইনি অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইঁহার সম্বন্ধে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া'—তাহা সার্থক উক্তি। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ভগবদ্ভক্তির স্রোত বহাইয়া দেন, বহু প্রাচীন কদাচার ও কুসংস্কার তাঁহারই প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে নূতন ভাব-ধারা তাঁহার জীবন ও শিক্ষা হইতে বঙ্গদেশে ও উৎকলে আসে, তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও উড়িয়া সাহিত্যে এক যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। চৈতন্যদেবের শিষ্য ও ভক্তেরা তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালায় এক বিরাট্ বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গালী জাতিকে এই সাহিত্যের একটী প্রধান দান,—মহাপুরুষের চরিত্র। চৈতন্যদেবের ও তাঁহার পরিকরের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সাধকের পবিত্র জীবন-চরিত লিখিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উপযোগিতা এবং গৌরব বাড়াইয়া দিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান পুস্তক এইগুলি :—[১] গোবিন্দদাস-কৃত 'কড়চা',—গোবিন্দদাস কর্ম্মকার চৈতন্যদেবের ভৃত্যরূপে তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসেন, এই বইয়ে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী ও চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে নানা কথা সুন্দর

সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (এই পুস্তক কিন্তু আসল নহে, বহু ভক্ত বৈষ্ণবের এইরূপ অভিমত); [২] বৃন্দাবনদাস-কৃত 'চৈতন্য-ভাগবত' (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)—ইহাতে সহজ ভাষায় চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। ইহাতে সমগ্র চৈতন্য-জীবনী পাওয়া যায় না, এবং চৈতন্যদেবের জীবনে নানা অলৌকিক ব্যাপারের কথা ইহাতে আছে; [৩] লোচনদাস-(১৫২৩-১৫৮০) কৃত 'চৈতন্য-মঙ্গল'—ইহাতে চৈতন্যদেবকে দেবতা-ভাবে দেখা হইয়াছে, ভাষার মাধুর্য্যে এই জীবন-চরিত অতি সুন্দর; [৪] কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ)—এই বই বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব বস্তু—একাধারে জীবন-চরিত এবং চরিত্র-চিত্রণ, অপার্থিব ভক্তি এবং দার্শনিক তত্ত্বের বিচারের সমাবেশ ইহাতে বিদ্যমান; [৫] জয়ানন্দ-কৃত 'চৈতন্য-মঙ্গল' (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে?)—অতি সরল ও মনোরম ভাবে লেখা এই জীবন-চরিতখানি হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়; [৬] নরহরি চক্রবর্ত্তী-কৃত 'ভক্তিরত্নাকর'—ইহাতে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনের নানা ঘটনা, এবং নানা বৈষ্ণব মতবাদ বিবৃত হইয়াছে; [৭] নিত্যানন্দ-কৃত 'প্রেমবিলাস'; [৮] যদুনন্দনদাস-কৃত 'কর্ণানন্দ'; [৯] ঈশান নাগর-কৃত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' (১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। অলৌকিক ব্যাপারে পূর্ণ হইলেও, এই জীবন-চরিতগুলি মহাপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার একটী উপযোগী উপায় বাঙ্গালীর সমক্ষে উপস্থিত করে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙ্গালী এ ভাবে দেশের মহাপুরুষদের সমাদর করিতে শিখিল না। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে দেওয়ান মাহুল্লা মণ্ডল

নামে একজন মুসলমান কবি হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবুর নামে 'কান্ত-নামা' বলিয়া একখানি চরিত্র-মূলক কাব্য লেখেন (১২৫০ সাল), তদ্রূপ পুস্তক বাঙ্গালায় আর বিশেষ মিলে না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে বহু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ও ব্রজবুলীতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ও চৈতন্যদেব-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তখন নবীন বৈষ্ণব দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া একটী বিশেষ সামঞ্জস্যময় ব্যাপার-রূপে কল্পিত হইতেছে, এবং চৈতন্যদেবের জীবনী ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মধ্যে ভক্তগণ একটী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মিল দেখিতে পাইতেছেন। দুই শতের অধিক কবি পদ রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গীতি-সাহিত্যকে মহার্হ রত্নমণ্ডিত করিয়া দেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি অনেক ছিলেন, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন [১] গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫০৭-১৬১২), ইনি ব্রজবুলীতে অতুলনীয় মাধুর্য্যময় ভাষার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ইনি বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের অনুসরণ করিয়াছেন; [২] জ্ঞানদাস (জন্ম ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ), ইনি বড়ু-চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন; [৩] বলরাম দাস; [৪] নরোত্তম দাস—ইঁহার রচিত ভগবদ্-বিষয়ক কতকগুলি প্রার্থনা-গীতি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর বস্তু। এই পদকর্ত্তৃগণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের লোক।

প্রথম যুগে রচনা, পরবর্ত্তী যুগে আলোচনা;—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে, আদি অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্য যুগের ও পরবর্ত্তী যুগের (অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের) পদকর্ত্তৃগণের পদ একত্র করিয়া কতকগুলি সংগ্রহ-পুস্তক গঠিত হয়। এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে বর্দ্ধমান-শ্রীখণ্ড-নিবাসী রামগোপাল দাস-কৃত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-

রসকল্পবল্লী' ও রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস-কৃত 'রসমঞ্জরী' (সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ), বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃত 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' (অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ), দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত' ও গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্ত্তনানন্দ' (অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ), রাধামোহন ঠাকুর-কৃত 'পদামৃত সমুদ্র' (সংস্কৃত টীকাসহ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ, আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১৭২৫), এবং বৈষ্ণবদাস (অথবা গোকুল কৃষ্ণানন্দ সেন) সঙ্কলিত 'পদকল্প-তরু' (অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৭৭০)—এগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও আধুনিকতর অন্য নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ-পুস্তক আছে। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থখানি এই সমস্ত পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্, ইহাতে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিচার- ও নির্দ্দেশ-অনুসারে সজ্জিত ৩১০১টী পদ আছে ; এক হিসাবে এই বইকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-সূক্তের ঋগ্বেদ' বলা যাইতে পারে। এই সব সংগ্রহ-পুস্তকের সাহায্যে বৈষ্ণব 'মহাজন-পদাবলী' রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

সাহিত্যের অন্যান্য ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। বৈষ্ণব-যুগে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে থাকে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের হাতে একটী বিরাট্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠে—এই গোস্বামিগণের মধ্যে সনাতন গোস্বামী, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী এবং রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অনুপমের পুত্র জীব গোস্বামী, তথা গোপাল ভট্ট (ইহারা ষোড়শ শতকের ব্যক্তি), এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (অষ্টাদশ শতক)—ইহারা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ইহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ গড়িয়া তুলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন, সেই সূত্রে হিন্দীর প্রভাবও বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যে কিছু কিছু আসে। সপ্তদশ শতকে দুইখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী বইয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ হয়—কৃষ্ণদাস বাবাজী-কৃত নাভাজীদাসের 'ভক্তমাল'-গ্রন্থের অনুবাদ, এবং পুরাতন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি চট্টগ্রাম অঞ্চলের আলাওল-কৃত মালিক মোহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ' বা পদ্মাবতী-কাব্যের অনুবাদ। 'পদুমাবৎ' একখানি অতি কঠিন কাব্য; আলাওল-কৃত ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটী অতি সুন্দর। কতকগুলি মুসলমান উপাখ্যানও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার দ্বারা অনূদিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার উপর আলাওলের অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল।

ধর্ম্মদেবের সেবক লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গালার একজন লোক-প্রিয় বীর ছিলেন। 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে তাঁহার উপাখ্যান ও কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণিত আছে। অধুনাতন বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ঢেকুর-গড়ের ইছাই ঘোষ, গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ধর্ম্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়,—লাউসেন তাঁহাদের সন্তান। বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ধর্ম্মদেবের বরে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। লাউসেনের বাল্য ও যৌবন, তাঁহার মাতুল ধর্ম্মপাল-রাজার পাত্র মাহুদ্যা বা মহামদ কর্ত্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু; এবং লাউসেনের নানা সংগ্রামে জয় ও নানা অলৌকিক

কীর্ত্তি—এই সব লইয়া কাহিনী, প্রাচীন বাঙ্গালার (বিশেষতঃ রাঢ়ের অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের) লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মদেবের মাহাত্ম্যের সহিত এই সব কাহিনী জড়িত। এই উপাখ্যান-মণ্ডলী লইয়া অনেক কবি বাঙ্গালায় 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' একখানি প্রাচীন পুস্তক, ও সম্পূর্ণরূপে এইটী পাওয়া গিয়াছে, ইহার রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত ঘনরামের 'ধর্ম্ম-মঙ্গল'ও এই উপাখ্যান-বিষয়ক একখানি সুবিদিত পুস্তক।—চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান লইয়া ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মাধবাচার্য্য এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী একখানি করিয়া 'চণ্ডী-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। কবিকঙ্কণের কাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অতি উজ্জ্বল রত্ন। প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও রীতিনীতির অমূল্য চিত্র এই পুস্তকে আছে। চরিত্র-চিত্রণেও কবিকঙ্কণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার চণ্ডী-কাব্যের কালকেতু ও ফুল্লরা, ধনপতি, লহনা ও খুল্লনা, দুর্ব্বলা দাসী ও ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি অতি সজীব চরিত্র। জনসাধারণের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত এই বইয়ে বর্ণিত আছে। কবিকঙ্কণ আমাদের যুগের মানুষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মতন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদের ধারা বৈষ্ণব লেখকদের হাতে অক্ষুণ্ণ ছিল। পুরাণ-কথা ভাষায় নূতন করিয়া শুনাইবার রীতি কখনও লুপ্ত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ

'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' নাম দিয়া ভাগবত-পুরাণের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ রচনা করেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কাশীরাম দাস বাঙ্গালায় মহাভারত-কাহিনী লেখেন। এই মহাভারতই এখন বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইহার বহুপূর্ব্বে, ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে, পূর্ব্ববঙ্গে 'বিজয়-পাণ্ডব-কথা' নামে মহাভারতের একটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা সংস্করণ রচিত হইয়াছিল।

বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যান ও মনসাদেবীর মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতকে ময়মনসিংহের কবি দ্বিজ বংশীদাস 'পদ্মপুরাণ' লেখেন, এবং কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ 'মনসার ভাসান' কাব্য রচনা করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্য্যদের কথা লইয়া, এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের উপাখ্যান লইয়া ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান', দুর্লভ মল্লিক-কৃত 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত'-প্রমুখ কতকগুলি কাব্য রচিত হয়। রাজা মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া না গেলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহা গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারিয়া, অনিচ্ছুক পুত্রকে তৎপত্নীদ্বয় অদুনা ও পদুনার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। সন্ন্যাসী অবস্থায় গুরুর সহিত গোপীচাঁদের ভ্রমণ, ও পরে সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতা ও পত্নীদ্বয়ের সহিত মিলন—ইহাই হইল এই আখ্যানের মূল বিষয়-বস্তু।

রামাই পণ্ডিতের পুস্তক বৌদ্ধ-অনুষ্ঠান-বিষয়ক 'শূন্য-পুরাণ' ও 'ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি' খুব সম্ভব ষোড়শ শতকের লেখা।

নানা দিক্ দিয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ফল-প্রসূ হইয়াছিল। ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ দিল্লীর মোগল বাদশাহদের অধীনে সুশাসনে ছিল; মোগল আমলে রাজ্যের মধ্যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ও প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি, বাঙ্গালার সাহিত্যিক উন্নতির একটা কারণ বলিয়া মনে হয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালার লোক-সাহিত্যের এক অভিনব প্রকাশ হয় পূর্ব্ববঙ্গের গাথায়—ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও রায়-বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ও সারল্যের খনি এই গীতিকাহিনীগুলি—এগুলি বাঙ্গালা ভাষার এক শ্রেষ্ঠ বস্তু। ময়মনসিংহ ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য জেলার কতক-গুলি সুন্দর সুন্দর গাথা দীনেশবাবুর চেষ্টায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে—এগুলির দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। ময়মনসিংহ-জেলায় প্রাপ্ত গাথাগুলির সঙ্গে নোয়াখালী-জেলায় প্রচলিত 'চৌধুরীর লড়াই' শীর্ষক পালাটী বিশেষ ভাবে উল্লেখের যোগ্য।

অষ্টাদশ শতক বাঙ্গালাদেশের পক্ষে নানা বিষয়ে পতনের যুগ। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতার হ্রাস ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ বাঙ্গালায় স্বাধীন নবাবদের প্রতিষ্ঠা হয়, ও তাঁহাদের অক্ষম শাসনে দেশের মধ্যে অশান্তি ও অরাজকতা বাড়িতে থাকে; পশ্চিম হইতে উড়িষ্যা-বিজয়ী নাগপুরের 'ভোন্‌স্‌লে' উপাধিধারী মারহাট্টা রাজার আক্রমণ, ও পশ্চিম বঙ্গে 'বর্গীর

হাঙ্গামা' অর্থাৎ 'বর্গী' বা মারহাট্টী লুঠেরা সিপাহীর উৎপাত; বণিক্ ইংরেজের সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিবাদ, ও ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলার পতন—এবং ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত; নবাব মীর-কাসীমের স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাইবার চেষ্টার ফলে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ ও তাঁহার পতন; ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের (বাঙ্গালা সন ১১৭৬ সালের) ভীষণ দুর্ভিক্ষ,—এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালাদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে সুপরিচিত; এবং ক্রমে ইংরেজদের হাতে সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির আগমন। এই সময়ে সাহিত্যে নূতন ধারা দেখা যায় না—পুরাতনেরই অনুকরণ ও অবনমন দেখা যায়।

এই যুগে বড় কবি বেশী হইতে পারে নাই। কেবল তিন-চারি জনের নাম করিতে পারা যায়—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (মৃত্যু ১৭৭৫), ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর (১৭১২-১৭৬০), ও ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ)। রামপ্রসাদ সেন তাঁহার সরল ভাষায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁহার আরাধ্যা দেবীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শাক্ত বা দেবী-বিষয়ক পদ বা গানগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিতেন। ভারতচন্দ্রের রচিত সুবিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' তিন খণ্ডে বিভক্ত—হর-গৌরীর লীলা-বিষয়ক অংশ প্রথমে, ও তৎপরে 'বিদ্যাসুন্দর' নামে উপাখ্যান, এবং শেষে জাহাঙ্গীরের সেনাপতিরূপে বঙ্গে আগত আম্বের-রাজ মানসিংহ ও যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং প্রতাপের মৃত্যু-বিষয়ক ঐতিহাসিক কাহিনী। এতদ্ভিন্ন

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও আছে। তিনি মার্জ্জিত শক্তির কবি, ভাষা-প্রয়োগে তিনি ছিলেন অসাধারণ রূপে পটু; তাঁহার কাব্যের দুই-এক স্থলে অশ্লীলতা দোষ থাকিলেও, বর্ণনার সরসতা এবং নিপুণ তুলিকায় চরিত্র অঙ্কনের শক্তি হেতু, আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। লোকে এক সময়ে ভারতচন্দ্রকে আমাদের ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিত; এবং তাঁহার রচিত ছত্র বা পয়ার বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদের মত এত পাওয়া যায় যে, তদ্দ্বারা সহজেই তাঁহার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে, কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস-কালে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত কাশী-খণ্ডের একটা পদ্যময় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার সমসাময়িক কাশীর বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে একটী নূতন বস্তু।

অষ্টাদশ শতকে লোকে হাল্‌কা গানে ও ছড়ায় প্রীতি লাভ করিত, ভাবের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীতেই মুগ্ধ হইত। এই যুগে কবির গান, এবং কবির লড়াই (অর্থাৎ সভায় কবিতে কবিতে পদ্যে কথা-কাটাকাটি) বিশেষরূপে প্রচলিত হয়; এবং সংস্কৃত পুরাণের উপাখ্যানগুলি তাহাদের মৌলিক গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া সাতিশয় প্রাকৃত-জনোচিত ভাবে পাঁচালীর পালায় গীত হইত।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পত্তন এই অষ্টাদশ শতকে। এ বিষয়ে বিদেশী পোর্ত্তুগীস ধর্ম্মপ্রচারকেরা একটু পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন নগরে পোর্ত্তুগীস পাদ্রি Manuel da Assumpçaõ মানুএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর বাঙ্গালা

ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরেই লিসবন্ হইতে Crepar Xaxtrer Orthbhed 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে এক গদ্যময় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়, ঐ পুস্তকে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম-মত ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এই দুই বইয়ে রোমান অক্ষরে পোর্ত্তুগীস উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানে বাঙ্গালা অংশ লিখিত হইয়াছে—তখনও বাঙ্গালা অক্ষর ছাপার হরফে উঠে নাই। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, পোর্ত্তুগীস মিশনারিদের চেষ্টায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত ভূষণার এক রাজকুমার খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-মত বিষয়ে একখানি বই লেখেন, এই বই এখন সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। রোমান অক্ষরে লেখা ইহার মূল পুস্তকখানি পোর্ত্তুগালে রক্ষিত আছে। ইহার ভাবা তেমন মার্জ্জিত নহে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর গদ্য মন্দ নহে। বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশে পোর্ত্তুগীস ও ইংরেজ মিশনারিদের কিছু যে হাত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংরেজদের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে Nathaniel Brassey Halhed নাথানিয়েল্ ব্রাসি হাল্‌হেড্-এর ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এবং এক দিকে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যেমন বাঙ্গালা বই ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে অন্য দিকে কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে, বিলাত হইতে আগত ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতদের হাতে, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য রূপ পাইবার চেষ্টা করিল।

উনবিংশ শতকে এইরূপে নবযুগের আরম্ভ। পুরাতন ও নূতন মনোভাবের দ্বন্দ্ব দুই পুরুষ ধরিয়া চলিল; এবং শেষে নূতনের বিজয় ঘটিল—উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে। আগেকার যুগের কবির লড়াই এবং ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্য-রচনা চলিতেছিল, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হইল উনবিংশ শতকের গোড়ায়, ও তাহার ফলে নব নব ভাব-ধারা আসিয়া বাঙ্গালীর চিত্তকে প্লাবিত করিয়া দিল, বাঙ্গালী নিজ ভাষায় নিজের নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখকে প্রকাশ করিতে চাহিল। আমরা এখনও এই যুগেরই হাওয়ার মধ্যে আছি। উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হয় নাই—এই সময়টা ছিল প্রস্তুত হওনের যুগ। রাজা রামমোহন রায়- (? ১৭৭৪-১৮৩৩) প্রমুখ দুই-চারিজন মনীষী আধুনিক শিক্ষার আবশ্যকীয়তা ও অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালীকে তদ্বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতার ও মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মূল-স্বরূপ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরও (বিশেষতঃ উপনিষদ্ ও বেদান্ত দর্শনের) আলোচনা করিতে উপদেশ দিলেন। নবীন যুগের ভাব-প্রকাশের উপযোগী গদ্য ভাষা গড়িয়া তুলিতেই উনবিংশ শতকের গোড়ার দুই-তিন দশক অতিবাহিত হইয়া গেল। নূতন ভাব ও নূতন ভাষা, উভয়কে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া Carey কেরী, Marshman মার্শ্‌মান, Ward ওয়ার্ড্-প্রমুখ শ্রীরামপুরের প্রটেস্‌টাণ্ট্-মতের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বাঙ্গালীজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও নমস্য। প্রথমটা যে গদ্য ভাষা দাঁড়াইল, তাহা কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে

চলিতে অক্ষম, এবং বাক্য-রীতিতে আড়ষ্ট। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ও বিশেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ কয়েকজন গদ্য-লেখকের হাতে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য-শৈলী অপূর্ব্ব প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্ব্ব যুগের শেষ কবি বলা যায় (১৮১১-১৮৫৮)। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ বলা চলে। তখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য পৌগণ্ডলাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক ভাবের সাহিত্য-ধর্ম্ম যাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এমন কতকগুলি কবি ও গদ্যলেখক দেখা দিলেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য যে নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই পথে ইঁহারা তাহার কর্ণধার হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান দুইজন—কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৫), ও ঔপন্যাসিক এবং নিবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ইঁহাদের নামে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগকে 'মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ' বলা যাইতে পারে। মধুসূদনের কীর্ত্তি—তিনি নিজ প্রতিভা- ও বিদ্যা-বলে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে নূতন জগতে প্রবেশ করান, নূতন ছন্দ এবং কবিতার রূপ (অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট্) বঙ্গভাষায় ব্যবহার করেন, ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি বঙ্গভাষার মধ্যে অতি কৃতিত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন; কিন্তু তাঁহার কাব্যের বিদেশীয় রূপের অন্তস্তলে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির ও প্রাণের সহিত এক গভীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সহানুভূতি ও সংযোগ প্রবাহিত।

তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬২), 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বাঙ্গালা ভাষায় অমর হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা নাটকও তাঁহার হাতে উৎকর্ষ-লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেকার সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায়। ইঁহার উপন্যাসগুলি ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। বাঙ্গালা সাধুভাষায় গদ্য রচনা বঙ্কিমের লেখনীতে চরম উন্নতি-শিখরে আরোহণ করে। বঙ্কিমের পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে একখানি পারিবারিক ঘটনা-সংবলিত গল্প লেখেন, এই বই ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং বর্ণনার সরসতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের কতটা শক্তি আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দেখাইলেন; বাঙ্গালী জাতি আর কিছুর জন্য না হউক, এই জন্য তাঁহার কাছে ঋণী থাকিবে। এতদ্ভিন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালী সমাজের সত্যকার চিত্র অঙ্কন করিলেন, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অতীত গৌরব-বোধ, জাতির জীবনের সঙ্গে গভীর সমবেদনা, জাতির সংস্কৃতির মূলে কি শক্তি আছে তাহা বুঝিয়া নিজেদের চালিত করা, বিশ্বের সমক্ষে ভারতবর্ষকে আবার বড় করিয়া তুলিয়া ধরা—এই সব বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে ও নিবন্ধে মূর্ত্ত করিয়া তুলিলেন। উনবিংশ শতকের বাঙ্গালার তথা ভারতের, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় আস্থাশীল চিত্তের প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র। দেশপ্রীতির ও দেশাত্ম-বোধের উদ্বোধনে তাঁহার লেখনীগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশের তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন প্রধান, তাহা বাঙ্গালী জাতি ও অন্য ভারতবাসী মানিয়া লইয়াছে।

বঙ্কিমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুগামী আর একজন মহাত্মার নাম করিতে হয়—স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মপ্রচারের মধ্য দিয়া ইনি ভারতীয় জনগণের আত্মচেতনাকে ও আত্মবিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে আধুনিক ভারতের মানসিক প্রগতি বিশেষ শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও ভারতের জনগণের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতিতে পূর্ণ ইঁহার অপূর্ব্ব শক্তিশালী রচনা বাঙ্গালা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ্।

মধূসূদন ও বঙ্কিমের যুগের বহু লেখকের মধ্যে এই কয়জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য :—[১] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৬)—ইনি রাজপুত ইতিহাসের কতকগুলি গৌরবময় কাহিনী আহরণ করিয়া অতি প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী ভাষায় কাব্য রচনা করেন ('পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী', এবং একটী মনোহর উড়িয়া ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্য)। এই সব কাব্যে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ছায়াপাত দেখিতে পাই। রঙ্গলালের বর্ণনা-দক্ষতা অসাধারণ ছিল। ১৮২৯ সালে রাজপুত জাতির বিশেষ গুণগ্রাহী Colonel James Tod কর্ণেল জেম্‌স্ টড্ রাজপুত জাতির ইতিহাস লিখিয়া Annals and Antiquities of Rajasthan নামে বিলাত হইতে প্রকাশিত করেন। এই বই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট নূতন একটী জগতের খবর দিল—এদেশে মহাভারত-রামায়ণের পার্শ্বেই যেন বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত 'রাজস্থান' গ্রন্থ স্থান পাইল। রাজপুতানার হিন্দু বীর ও বীরাঙ্গনাগণের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা বাঙ্গালীর চিত্তকে জয় করিল। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য,

নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা অংশ এই 'রাজস্থান' গ্রন্থেরই প্রভাবের ফল। রঙ্গলালের রচিত রাজস্থানের আখ্যান-মূলক তিনটী কাব্য বাঙ্গালীর কাছে দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্য ও ত্যাগের বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। [২] বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)—বাঙ্গালা কবিতায় ইনি নূতন ধরণের কল্পনা-শক্তি ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রদর্শন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রভাব মানিয়াছেন। [৩] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)—মধুসূদনের অনুপ্রেরণায় 'বৃত্র-সংহার' কাব্য লেখেন, এবং কবিতায় স্বদেশপ্রীতি প্রচার করেন। [৪] নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)—ইনিও হেমচন্দ্রের মত মধুসূদনের অনুকরণে কতকগুলি বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ লেখেন ('কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস'), এতদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ', এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে আরও তিনখানি কাব্য ('অমিতাভ', 'খ্রীষ্ট', 'অমৃতাভ') প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আত্মজীবনী ('আমার জীবন') মানবচরিত্র ও সমসাময়িক ঘটনাবলী-সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রকাশক এক উপাদেয় গ্রন্থ। [৫] রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)—ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক, ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক—এই যুগের মানসিক সংস্কৃতির একজন নেতা ছিলেন; উপন্যাস রচনায় ইনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণ', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', এবং সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' ও 'সমাজ' সুপরিচিত পুস্তক। রমেশচন্দ্র ইংরেজীতে লিখিয়াও বিলাতে যশস্বী হইয়াছিলেন।

[৬] গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১)—বঙ্গভাষার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার—প্রায় ৯০খানি বড় নাটক ও নক্সা এবং প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'বুদ্ধদেব', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'অশোক', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি অনেকগুলিই বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক। গিরিশচন্দ্রের কৃত অমর কবি উইলিয়াম-শেক্‌স্পিয়র্-এর 'ম্যাক্‌বেথ্' নাটকের অনুবাদটী বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, কতকগুলি নাটকে তিনি সমাজের কথা বলিয়াছেন, এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন। [৭] অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)—এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক সামাজিক নাটক-রচয়িতা ছিলেন। ইঁহার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যে একটী অন্তর্নিহিত আদর্শবাদ লক্ষণীয়—বাঙ্গালীর জাতীয়তা ইঁহার নিকট সর্ব্বথা রক্ষণীয় বস্তু ছিল।

মধুসূদন ও বঙ্কিমের যুগে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কবি ও অন্য লেখক উদ্ভূত হন। এই যুগে ইঁহাদের সকলের হাতে নবীন বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের অনেক অংশে নিজেকে দেখিতে ও জানিতে সমর্থ হইলেন। ইঁহাদের যুগের প্রসার ঊনবিংশ শতকের শেষ বা বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্য্যন্ত (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্য্যন্ত) ধরা যায়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান বা তৃতীয় যুগকে, রবীন্দ্রনাথের মানসিক ও নৈতিক মহান্ প্রভাব-দ্বারা প্রভাবান্বিত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারা যায়, যদিও পূর্ব্ব যুগের মধুসূদন-বঙ্কিম-

বিবেকানন্দের প্রভাব হইতে এই যুগ একেবারে মুক্ত হয় নাই—তাঁহাদের চিন্তাধারা ও শক্তি এখনও কার্য্য করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্কিমের জীবৎকালেই কবিতা ও অন্য রচনায় উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা শীঘ্রই স্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং একথা এক্ষণে সকলেই অল্প-বিস্তর মানিয়া লইয়াছেন যে, জগতের মধ্যে এখন রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠতম জীবিত কবি। ইউরোপ এবং আমেরিকা তথা এশিয়ার দেশগুলিও তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকে কবি-সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়া জগতের তাবৎ সভ্যজাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অদ্ভুত ভাবে সর্ব্বতোমুখী। কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস—সব বিষয়ে তিনি নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া তাঁহার চমৎকৃত ও প্রীত দেশবাসীর চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯১১ সালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রমুখাৎ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করে, তাঁহার পূর্ব্বেকার কোনও লেখকের এরূপ সংবর্দ্ধনা বাঙ্গালা দেশ কখনও করিতে পারে নাই। ১৯১৩ সালে তাঁহার নিজ অনূদিত ‘গীতাঞ্জলি’ পুস্তকের জন্য সুইডেন হইতে তিনি নোবেল-পুরস্কার পান, এবং ইহার দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে সমগ্র সভ্য জগতের চোখের সাম্নে আসেন। ইহার পরে ক্রমশঃ সমস্ত জগৎ তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের অনুবাদ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষায় বাহির হইয়াছে।

তাঁহার কৃতিত্বের ফলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য লোকচক্ষে এতটা উন্নীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার মত শক্তিশালী লেখক এখন বাঙ্গালায় কেহ নাই। বিগত পঁচিশ-তিরিশ বৎসরকে বিশেষভাবে 'রবীন্দ্রের যুগ' বলিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও অনুবর্ত্তী বহু কবি, ঔপন্যাসিক ও অন্য লেখক বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায় না,—কেবল সংক্ষেপে কতকগুলি নাম করিতে পারা যায়—অক্ষয়কুমার বড়াল (কবি—১৮৬৫-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (কবি—১৮৫৫-১৯১৯), রজনীকান্ত সেন (কবি —১৮৬৫-১৯১০), কামিনী রায় (কবি—১৮৬৪-১৯৩৩), স্বর্ণ-কুমারী দেবী (ঔপন্যাসিক—১৮৫৬-১৯৩২), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি—১৮৮২-১৯২২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক —১৮৭০-১৯৫৩), ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কবি ও নাট্যকার— ১৮৬৩-১৯১৩)। ইঁহারা ছাড়া আরও অনেক উৎকৃষ্ট লেখক গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই যুগের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য—ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৬৬)। ইঁহার উপন্যাসে সামাজিক ও অন্য অত্যাচারে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট বাঙ্গালার জনগণ যেন নূতন ভাষা পাইয়াছে—ইনি সত্য-দিদৃক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং যে অন্যায়, অবিচার ও দৌর্ব্বল্য তিনি দেখিয়াছেন, মর্ম্মস্পর্শী সারল্যের সহিত তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। তবে ইনি সমাজের নানা জটিল সমস্যার

সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু বলেন নাই—অপূর্ব্ব শক্তি ও নিপুণতার সহিত সমস্যাগুলিকে কতক অংশে বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। এই আত্মপরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগে লেখা উপন্যাসে, যেরূপ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি অল্পসংখ্যক ঔপন্যাসিকই করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যের এই তৃতীয় যুগে, বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্যের ভাষার আড়ষ্ট ভাবকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া মৌখিক ভাষার অনুসারী হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মজ্জাগত শক্তি এখন নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সাহিত্যে বহুশঃ ব্যবহৃত হইতেছে। এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ; ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার লোক-ভাষায় ইঁহার 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার একটা কুফল দাঁড়াইতেছে—কলিকাতার মৌখিক ভাষা ভালরূপে না জানিয়া কতকগুলি লেখক ভাষায় নানা প্রকারের অশোভন গ্রাম্যতা ও অরাজকতা আনিতেছেন।

বাঙ্গালার সাহিত্য উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধমান, বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে এই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু একটা গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে। জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয় জাতীয় সাহিত্যে। সেই জীবনে যখন সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি থাকে, জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকে, তখনই যে *সাহিত্যে জীবন প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হয়,*

সেই সাহিত্য প্রাণবান্ ও সারবান্ এবং চিরন্তন সত্যের আধার হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, দেশের জনগণের আত্মিক শক্তির হ্রাস ঘটে,—জাতির মধ্যে যেখানে অনৈক্য, ভাব-বিরোধ, ও আত্ম-কলহ আসিয়া যায়, সেখানে সাহিত্য কিছুতেই শক্তিশালী বা জীবন্ত, সারবান্ বা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া বাঙ্গালী আজকাল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি আর অটুট থাকিতেছে না ; ইহাতে তাহার মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহার আধুনিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা কেবল ভস্মে ঘী ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে, তাহার সাহিত্যিক পূর্ব্বগৌরব অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালী জাতি বড় না হইলে, পার্থিব ও অপার্থিব জগতে শক্তিশালী না হইলে, আত্মিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন না হইলে, বাঙ্গালীর সাহিত্য বড় থাকিতে পারিবে না। এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্ব আছে—তাহার নিজের প্রতি, তাহার পিতৃপুরুষগণের প্রতি, এবং তাহার ভবিষ্যদ্-বংশীয়গণের প্রতি।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের কতকগুলি প্রধান প্রধান তারিখ

৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ (আনুমানিক)	মৌর্য্যবিজয়, বাঙ্গালাদেশে আর্য্যভাষার প্রসার।
৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ	বাঙ্গালাদেশে গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকার ও উত্তর-ভারতের সভ্যতার প্রসার।
৭৪০ „ (আনুমানিক)	পাল-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা।
১০৩৮ „ „	দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধ আচার্য্য।
১১১০ „ „	মহারাজ বল্লাল সেন।
১১৮০ „ „	জয়দেব কবি—মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায়।
১২০০ „ „	মুসলমান তূর্কীগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ-বিজয়ের সূত্রপাত।
১৪০০ „ „	বড়ু-চণ্ডীদাসের জীবৎকাল (?)—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ।
১৪০০ „ „	মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল।
১৪১৮ „ „	রাজা গণেশ (দনুজমর্দ্দনদেব)।
১৪৩০ „ „	কৃত্তিবাসের জীবৎকাল।
১৪৮০ „ „	মালাধর বসু। বিজয় গুপ্ত।
১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ	চৈতন্যদেবের জীবৎকাল।

১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ হোসেন শাহ্, বাঙ্গালার সুলতান।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পোর্ত্তুগীস্‌দিগের প্রথম বঙ্গে আগমন।

১৫২৬ " উত্তর-হিন্দুস্থানে বাবর কর্ত্তৃক মোগল-সাম্রাজ্য-স্থাপন। [পাঞ্জাবে গুরু নানক।]

১৫৪০ " (আনুমানিক) বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণব গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠা।

১৫৫০ " মাণিক গাঙ্গুলী—'ধর্ম্মমঙ্গল'।

১৫৭৫ " বঙ্গে মোগল অধিকার।

১৫৮০ " কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম।

১৬৫০ " (আনুমানিক) কাশীরাম দাস।

১৬৫১ " ইংরেজদের প্রথম বঙ্গে আগমন।

১৬৯১ " কলিকাতায় ইংরেজদের বাস।

১৭৪০ " রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল।

১৭৪৩ " বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, রোমান অক্ষরে লিস্‌বনে ছাপা পোর্ত্তুগীস পাদ্রি আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর বই।

১৭৫৭ " পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬৫ " নবাব মীর-কাসিমের পরাজয়ের পরে 'ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানী' কর্ত্তৃক শাহ্ আলম বাদশাহের নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।

১৭৭৮ " হাল্‌হেড্‌-কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ	কলিকাতায় 'ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠা।
১৮০৪ "	শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রণ।
১৮১৬ "	'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা।
১৮১৬ "	প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র—গঙ্গাকিশোর ভট্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বাঙ্গালা গেজেট'।
১৮১৮ "	বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র—'সমাচার দর্পণ' (J. C. Marshman মার্শ্‌মান, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, শ্রীরামপুর)।
১৮৩০ "	ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৮ "	আদালতে ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজীর প্রচলন।
১৮৫৮ "	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
১৮৬৩ "	'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা'।
১৮৬৯ "	বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস,—'দুর্গেশনন্দিনী'
১৮৭২ "	বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ।
১৮৯৫ "	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা।
১৯০৪ "	বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন।
১৯১৩ "	রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পারিতোষিক প্রাপ্তি।